ভালো ছেলে

মতি নন্দী

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

এই লেখকের অন্যান্য বই
দুঃখের বা সুখের জন্য
বারান্দা
সবাই যাচ্ছে

অনন্তের ক্লাস নাইনের এবং অমরের ক্লাস এইটের এগার দিন পর অফিস থেকে বাড়ি ফেরার সময় বাসে উঠতে গিয়ে শক্তিপদ পিছলে চাকার তলায় চলে যায়। মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। হাতে ছিল তাঁর দু' ছেলে অনন্ত আর অমরের জন্য দু জোড়া চটির বাক্স।

"যদি ও দুটো হাতে না থাকত তাহলে শক্তিদা হ্যাণ্ডেলটা ভাল করে ধরতে পারতেন।"

মাস ছয়েক পর এক সন্ধ্যায় শক্তিপদের অফিসের সহকর্মী অবিনাশ কথাটা বলেছিল তাদের ঘরে বসে। অনন্ত আর অমর পরস্পরের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিয়েছিল। ধীরে ধীরে পাংশু হয়ে যায় তাদের মুখ। মৃত্যুর তিন দিন আগে শক্তিপদ কয়েক আউন্স উল আর বোনার কাঁটা অনিমার জন্য আর এক বাক্স রঙ পেন্সিল অলকার জন্য কিনে এনেছিলেন। ওরা ক্লাসে উঠেছে ফাইভে আর ফোরে।

শীলা বলেছিল, "মেয়েদের দিলে, আর ছেলেরা বুঝি ক্লাসে ওঠেনি?"

অনন্ত আর অমর চোখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল।

"মাকে বল্ না আমাদের চটি নেই।" অনন্ত বলেছিল। অমর একটু গোঁয়ার, মুখ আলগা। সে চেঁচিয়েই শীলাকে জানিয়ে দেয়, "আমার আর দাদার জন্য চটি চাই।"

সেই চটি কিনে বাসে উঠতে গিয়ে...অবিনাশ তাই বলেছিল, "বাক্সদুটো হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল, সামলাতে গিয়ে রড থেকে হাতটা পিছলে গেল।"

"বাক্স দুটোর কি হল, আমরা ত চটি পাইনি!" অমর ক্ষুণ্ণস্বরে বলেছিল।

অমরটা বোকা, ওর প্রথম চিন্তাই চটি। ভিড় আর উত্তেজনার মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ তুলে নিয়েছিল রাস্তা থেকে। কিন্তু অনন্ত একটা কথাই তখন ভেবেছিল, 'যদি ও-দুটো হাতে না থাকত' তাহলে বোধহয় বাবার মৃত্যু হত না।

সেই সময় রেকাবিতে পরোটা আর বেগুন ভাজা নিয়ে অনিমা ঘরে ঢোকে। অবিনাশ আপত্তি জানাবার জন্য রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলেছিল, "এলেই যদি এইরকম খাবার দেন বৌদি তাহলে কিন্তু আর আসব না।"

"এ আর কি এমন।"

শীলা রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে জানায়।

অবিনাশ তখন প্রায় অভিভাবক হয়ে উঠেছিল। রোজই আসত। সংসারের খুঁটিনাটি

ব্যাপারও তার পরামর্শ ছাড়া চলত না। পাঁচজনের পরিবার একসময় তার অনুগ্রহনির্ভর হয়ে চলেছিল।

শক্তিপদর মৃত্যুর দিন শীলার হাতে ছিল বত্রিশ টাকা। মাইনের টাকা শক্তিপদ নিজের কাছে স্টিল আলমারির লকারে রাখত, চাবিও থাকত তার কাছে।

চাবির রিংটা ছিল প্যান্টের পকেটে হাসপাতালের কেরানী সেটা শীলাকে দিতে অস্বীকার করে। মৃত শক্তিপদর সঙ্গে পাওয়া জিনিসগুলো যেমন রুমাল, নস্যির ডিবে, চটির বিল, চশমার খাপ, মানিব্যাগ, পাঁচটি চাবিসহ রিং আর একটা ডাকঘরের খাম পুলিসের হাতে তুলে দেয়। খামটির এক ধার ছেঁড়া ভিতরে একটি চিঠি। পুলিসের এস আই বলেছিল পরদিন থানা থেকে মৃতের জিনিসগুলো প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যেতে।

অবিনাশের এক আত্মীয় পুলিসের পদস্থ অফিসার। তাকে সে অনুরোধ করেছিল জিনিসগুলো বিনা ঝামেলায় ফেরত পাবার জন্য। পরদিন শক্তিপদকে দাহ করে ফেরার সময় অনন্তকে সঙ্গে নিয়ে অবিনাশ থানায় যেতেই জিনিসগুলো কিঞ্চিৎ খাতিরসহই ফেরত পায়। অনন্ত একটা খাতায় সই করে জিনিসগুলো নেয়। তখন সে জানত না খামের মধ্যে চিঠিটা কার লেখা এবং তাতে কি লেখা। বাড়ি ফিরে প্রথমেই টাকার জন্য আলমারি খোলা হয়। তারপর সে বাবার জিনিসগুলো এবং খামটিও লকারে রেখে চাবি বন্ধ করে দিয়েছিল। এরপর নানা কাগজপত্র বার করার জন্য লকার খোলা হয়েছে কিন্তু এককোণে প্লাস্টিকের মোড়কে সুতো দিয়ে বেঁধে-রাখা ওই জিনিসগুলো বা খামটিতে হাত আর দেওয়া হয়নি।

সাকসেসন সার্টিফিকেট বার করা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা, এগার দিন চাকুরির মাইনে, এছাড়াও জীবনবীমার তিন হাজার টাকা, সবই অবিনাশ সংগ্রহ করে দিয়েছিল। শীলাকে সঙ্গে নিয়ে কখন বা অনন্তকে নিয়ে সে ট্রামে, বাসে, ট্যাক্সিতে আদালতে এবং অফিসে অফিসে ঘুরেছে নিজের খরচে, ঘুষ দেবার প্রয়োজন হলে নিজের পকেট থেকেই দিয়েছে।

"আপনার ঋণ কিভাবে যে শোধ করব ঠাকুরপো...আমার ছেলেমেয়েদের উপর ভগবানের কি যে অসীম দয়া, না হলে এমন বিপদের দিনে কি আপনাকে পেতাম! তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাকে।"

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের তের হাজার টাকার চেক নিয়ে নামার সময় শীলা যখন কথাগুলি বলছিল, প্রৌঢ় লিফটম্যানের মুখে তখন এক চিলতে হাসি দেখেছিল অনন্ত। জীবন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত একটা ধারণায় পৌঁছবার পর মানুষ এমন বৈরাগীর মত হাসতে পারে। অবিনাশের মুখেও একটা হাসি ফুটে উঠেছিল—কিছুটা আত্মসুখ, কিছুটা বিনয় ও উদ্বেগ মেশানো।

"ওসব পরে শুনব, আগে এই চারটে নাবালকের কথা ত ভাবতে হবে।"

এবার হাঁটতে হাঁটতে তারা সার্কুলার রোডে আসে।

"চা খাবেন বৌদি?"

"আপনি খান, আমি দোকানের ছোঁয়াছুঁয়ি..."

বিধবা জীবনে শীলা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল কয়েক সপ্তাহেই।

অবিনাশ চায়ের বদলে কোকাকোলা খেয়েছিল দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। অনন্ত জীবনে সেই প্রথম এই পানীয়ের আস্বাদ পায়। তার ভাল লেগেছিল এবং তিন ভাইবোনের কথা মনে পড়ে বিষণ্ণ বোধ করে।

"শক্তিদার ত আরও বেশি থাকার কথা।"

"হবে, আমি ত এসব খবর রাখতুম না। সংসারের টাকা আমার হাতে কখনও দিতেন না। ঝিয়ের মাইনেটাও নিজে হাতে দিতেন। আমি বরং কখন-সখন..."

অনন্ত জানে মা কেন থেমে গেছল। বাবা পাইখানা গেলে মা তার পকেট হাতড়ে বা মানিব্যাগ থেকে দু-তিন টাকা সরাত। একদিন সে দেখে ফেলেছিল। কাউকে সে-কথা সে বলেনি। বাবার নিশ্চয় সন্দেহ হত। মানিব্যাগ খুলে একদিন বাবাকে ভ্রূ কোঁচকাতে দেখেছিল। অনন্ত ভয়ে ভয়ে থাকত, হয়ত বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, ব্যাগে টাকা কমে গেল কেন? কিন্তু করেনি।

টাকা নিয়ে মা কি করত। অনন্ত স্কুল থেকে ফিরে একদিন দেখেছিল রাস্তায় সদর দরজার সামনে তিন চারটি লঙ্কা-নুন-মাখা শালপাতা। কেউ আলুকাবলি বা ফুচকা খেয়েছে। কে খেয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই মা থতমত খেত।

"ওপরের মেজবৌ কি রত্না বোধহয়, প্রায়ই ত ডেকে ডেকে কিনে খায়।"

আর একদিন স্কুল থেকে ফিরে দেখল মা বাড়ি নেই। অমর তার আগে স্কুল থেকে পৌঁছে খেতে শুরু করে দিয়েছে।

"মা কোথায় রে?"

"অনু আর অলুকে নিয়ে সিনেমা গেছে।"

"পয়সা পেল কোথায়? তুই জানলি কি করে?"

"কে জানে কোথায় পেয়েছে, ওপরের জেঠিমা বলল।

অলুর স্কুল সকালে, দশটার মধ্যেই সে বাড়ি ফিরে আসে।

"অনু স্কুলে যায়নি?"

"বোধহয় হাফ-ছুটি করে চলে এসেছে।"

"তালা দিয়ে গেছল?"

"ওপরে চাবি রেখে গেছে।"

ওপরে আছে বাড়িওয়ালার আত্মীয় এক পরিবার। বিশেষ মাখামাখি নেই। বাড়িওয়ালা থাকে শিলিগুড়ি। অনন্ত তাকে কখনও দেখেনি। ওপরের জ্যাঠামশাই আর তার ভাই বাড়িওয়ালার ভূমিকা নিয়েই বসবাস করে। তবে প্রতি মাসের পাঁচ তারিখে বাবা মানিঅর্ডারে ভাড়ার পঁয়ষট্টি টাকা শিলিগুড়িতে পাঠিয়ে দেয় জনৈক সুখরঞ্জন পোদ্দারের নামে। একবারের জন্যও পাঁচ তারিখের নড়চড় হয়নি। নামটা সে জেনেছে যেহেতু পোস্ট অফিসে গিয়ে মানিঅর্ডার করার ভার ছিল তার উপর। দু-বছর পর বাবা

মারা যাবার তিনমাস আগে পঁয়ষট্টি হয়েছিল সন্তর।

বাবা পছন্দ করত না পাড়ারলোক বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মেলামেশা বা ঘনিষ্ঠতা। কলকাতায় বৌবাজারে আর জামশেদপুরে থাকে দুই মামা, কিন্তু সম্পর্ক নেই। যাদবপুরে কাকার রেস্টুরেন্ট আছে, অবস্থা ভাল, তার সঙ্গেও বাবার মুখ দেখাদেখি নেই। ঠাকুমা আর ঠাকুর্দা ছিল কাকার সঙ্গে। দুজনেই মারা গেছে। ভাইয়ের সঙ্গে বাবার যে কেন ঝগড়া, অনন্ত তা জানে না।

মা সিনেমা দেখত বা এটাসেটা কিনে খেত এবং সেজন্য কোথা থেকে পয়সা পেত, শুধু অনন্ত নয় তার ভাইবোনেরাও তা বুঝে গেছল। শীলা হয়ত সেটা জানত কিংবা জানত না। সে প্রায় নিরক্ষর এবং সরল আর অসম্ভব পরিশ্রমী। কিন্তু ছেলেমেয়েরা বাবার কানে তোলেনি। তারা মাকে ভালবাসে।

কোকাকোলা খাবার পর সেদিন ট্রামে উঠে ওরা লম্বা সীটে পাশাপাশি বসেছিল। মাঝখানে শীলা।

"দু মাস আগে চার হাজার টাকা পি· এফ· থেকে তুলেছিলেন, ওরা খাতা থেকে আমায় দেখাল। কিজন্য, কিছু জানেন কি ?"

শীলা মাথা নাড়ল।

"দু বছর আগে তিন হাজার।"

শীলার বিভ্রান্তি অব্যাহত। সে তাকাল অনন্তর দিকে।

"কিছু জানিস ?"

অনন্ত মাথা নাড়ল। বাবা খুব খরচে লোক নয়। ছেলেমেয়েদের জন্য কেনাকাটার বা খাওয়া-দাওয়ার বা বেড়ানর জন্য খরচ করত না। নিজের জন্যও নয়। একজোড়া প্যান্ট আর একজোড়া হাওয়াই শার্ট, সারা বছর অফিসের জন্য ওই পোশাক। ফিতেওলা জুতো তিন বছর ত চলতই। মোজা থেকে সব কটা আঙুল বেরিয়ে থাকত।

বাবার এত টাকা তোলার কেন দরকার হল ? ধার-দেনা ছিল কি ?

অনন্তের কাছে সেটা তখন রীতিমত রহস্যময় মনে হয়েছিল এবং বাড়ি ফিরে চেকটা আলমারির লকারে রাখতে গিয়ে প্লাস্টিকের মোড়কটা দেখে হঠাৎ তার মনে হয়েছিল বাবার পকেটে খামের মধ্যে যে চিঠিটা ছিল সেটা আজও দেখা হয়নি।

মোড়ক থেকে খামটা বার করে পকেটে রাখার সময় সে পিছন ফিরে দেখে ঘরে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা। ঘরে তখন অনু আর অলু ছাড়া কেউ ছিল না।

কেন যে তার মনে হয়েছিল চিঠিটা সবার সামনে পড়া উচিত নয়, তা সে আজ একুশ বছর পরও জানে না। কিন্তু অদ্ভুত অন্যায় খবর পাওয়া যাবে যেটা কাউকে বলার নয়, এমন একটা ধারণা সেই মুহূর্তে হয়েছিল। অন্যের চিঠি পড়া উচিত নয় এই বোধটাও তখন কাজ করছিল প্রবলভাবে।

বাড়ির কোথাও বসে সবার চোখ এড়িয়ে পড়ার জায়গা নেই। সন্ধ্যার পর পার্কের

মাঝে আলোর নিচে গিয়ে বসল চিঠিটা পড়ার জন্য। দুটি তাসের আসর গোল হয়ে। তাদের থেকে কিছু দূরে সে বসেছিল। খামের উপর ঠিকানা ইংরাজিতে, অক্ষরগুলো মেয়েলি ছাঁদের। শেষবারের মত সে ইতস্তত করেছিল চিঠিটা বার করার আগে।

চার ভাঁজ করা ছোট চিঠি।

"শক্তি,

আজও তোমার অফিসের সামনে রাস্তার ওপারে ছুটির সময় অপেক্ষা করেছি। এই নিয়ে পর পর চারদিন। তুমি বেরোলে দেখলাম, নিজের মনে হেঁটে স্টপে গিয়ে বাসে উঠে বাড়ি চলে গেলে। একবার মুখ তুলে তাকালেও না কোনদিকে। তাহলে দেখতে পেতে এক অভাগিনীকে। আমি কি দোষ করলাম যে গত এক মাসে একবারও এলে না। লক্ষ্মীটি এস। যদি অপরাধ করে থাকি পায়ে ধরে মাপ চাইব। এস এস এস। ভালবাসা নিও। প্রণাম নিও।

ইতি

মিনু (১১ ডিসেম্বর)

এক নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়ে ফ্যালফ্যাল করে অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকেছিল মিনিট দুই। তারপর প্রথমেই সে ভেবেছিল, কে এই মিনু ? বাবার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ?

চিঠিটা সে তিনবার পড়েছিল আর ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারল এই পত্র-লেখিকার সঙ্গে তার বাবার কিছু একটা গোপন সম্পর্ক রয়েছে যার সম্পর্কে ঘুনাক্ষরেও তারা কিছু জানে না। 'মিনু' নামটি কখন তাদের সংসারে উচ্চারিত হতে সে শোনেনি। চিঠির বিষয় থেকে মনে হয় দুজনের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক। এটা ভাবতেই সে মনে মনে অপরাধীর মত কুণ্ঠায় জড়সড় হয়ে যায়। বাবার ব্যক্তিগত জীবনের একটা আড়াল করা দিক হঠাৎ পর্দা সরিয়ে দেখে ফেলার মত লজ্জায় সে ভরে গেছল। আর সেই কুণ্ঠা এবং লজ্জার কারণ, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে গিয়েও সে কিন্তু ছিঁড়তে পারেনি। সে ভাবতে পারছিল না তার মা ছাড়াও আর কোন মেয়েলোক বাবার জীবনে থাকতে পারে। তার মনে হয়েছিল বাবার এটা জঘন্য কাজ।

চিঠিটা তাকে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেছল। পার্কে বসে তাসুড়েদের চেঁচামেচির মধ্যে বাবাকে দুশ্চরিত্র ভাবতে তার বাধছিল অথচ মন থেকে সায়ও পাচ্ছিল না। তখন তার কৈশোর বয়স। সে বার বার বাবার আচরণ, কথাবার্তার মধ্য দিয়ে খুঁজতে চাইল কোন অসঙ্গতি, অযৌক্তিক কাজ কিংবা মা'র সঙ্গে ঝগড়া, মনোমালিন্য পাওয়া যায় কিনা।

কিছুই পায়নি। মা'র সঙ্গে কোনদিন উঁচুস্বরে বাবা কথা বলেছে বা বিরক্তি প্রকাশ করেছে বা অবহেলা দেখিয়েছে এমন কোন উদাহরণ সে সংগ্রহ করতে পারল না। খুব রেগে উঠলে তার চোয়ালের পেশী দপদপ করত কিন্তু মা'র জন্য একবারও করেনি। অনন্ত কোনদিন মৃদু বা গাঢ়স্বরে দুজনকে কথা বলতে বা চোখে চোখ রাখতে দেখেনি

অথচ পরস্পরের প্রতি আচরণে তাদের খুঁত নেই। যন্ত্রের মত নিখুঁত ছিল সম্পর্ক।

রাত্রে আঁচাবার সময় অনন্ত মাকে উনুনের আঁচ শিক দিয়ে খুঁচিয়ে নামাতে দেখে সাধারণভাবেই জিজ্ঞাসা করেছিল, "মিনু বলে কাউকে চেন ?"

শীলা একবার মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "না।" কয়েক সেকেণ্ড পর আবার বলেছিল "কেন ?"

অনন্ত জবাব দেয়নি।

একুশ বছর পর চল্লিশের দিকে ঢলে-পড়া বয়সে মধ্যরাত্রে বিছানায় শুয়ে সে সেদিনের মত আবার নিশ্চিন্ত হল একটা ব্যাপারে। চটির বাক্স হাতে ছিল বলে বাবা বাসের হাতল ধরতে পারেনি এই যুক্তিটা ঠিক নয়। বাবার সম্পর্কে একটা রহস্য জেনে যাওয়ার পর সেই রাতে অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে তার মনে হয়েছিল চিঠিটা সম্ভবত সেইদিনই বাবার হাতে এসেছিল যেদিন মারা যায়। হয়ত বাবা মিনুকে এড়াবার জন্যই চলন্ত বাসে ওঠার চেষ্টা করেছিল কিংবা চিঠিটা পড়ে এতই চঞ্চল বা অন্যমনস্ক হয়ে গেছল...আর যাইহোক চটির বাক্সে হাতজোড়া হয়ে থাকার কারণটা, যা অবিনাশকাকা প্রায়ই বলেন এবং প্রতিবার শুনে বুকের উপর সে পাষাণভার বোধ করে, সেটা ঠিক নয়।

সেই রাতে পাষাণভারটা মন থেকে নেমে তাকে হাল্কা করে দেয়। চিঠিটা পড়ার জন্য সে আর নিজেকে অপরাধী মনে করেনি এবং সেটা আজও সে নষ্ট করেনি।

বিছানা থেকে উঠে আলো জ্বেলে ঘরের কোণে জলচৌকির উপর থাক্ দিয়ে রাখা স্টিলের দুটো ট্রাঙ্কের উপরেরটি খুলল। ডালার খোপে গোঁজা কয়েকটি কাগজ থেকে সে চার-ভাঁজ করা একটি চিঠি বার করল।

চিঠিটি অনন্তের স্ত্রীর। বহুবার পড়েছে গত দুদিনে। আবার সে পড়ার জন্য ভাঁজগুলো খুলতে লাগল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনন্তের স্ত্রীর নাম রেবতী। তার কথা ভাবতে ভাবতেই কিছুক্ষণের জন্য একুশ বছর পিছনের দিকে তাকিয়েছিল। যথেষ্ট উপরে উঠে পাখির-নজরে সে নিজের পিছন দিকে তাকাবে এমন ক্ষমতা তার নেই। জমির উপর দাঁড়িয়ে গিরিশ্রেণী দেখার মত সে উঁচু-নিচু জীবনের কয়েকটা চূড়ামাত্র দেখতে পায়। তারই একটি, বাবাকে লেখা চিঠিটা।

এরপরের চূড়া ক্লাস টেন-এ তার ফেল হওয়া। এই নিয়ে স্কুল-জীবনে সে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হল। প্রথমবার ক্লাস ফোর-এ। অমর তৃতীয় হয়ে ক্লাস টেন-এ ওঠে। ও ভাল ছাত্র। সবাই বলে অমর কিছু একটা হবে। হয়েওছে। সে এখন দিল্লিতে থাকে। বড় একটা চামড়া-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সংযোগ রাখার দায়িত্বে আছে।

বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের তের হাজার টাকা, অবিনাশ কাকার পরামর্শে পোস্ট অফিসের ক্যাশ সার্টিফিকেটে রাখা হয়েছিল অনু আর অলুর বিয়ের জন্য। ব্যাঙ্কে সাতশ এগার টাকা আর অফিস থেকে সাহায্য বাবদ দু হাজার টাকা। পুরো একটা বছর ঘর ভাড়া আর চারজনের স্কুল খরচ দিয়ে সাতাশ শ' টাকায় সংসার চলেছে, অনন্ত এখন তা ভাবতে পারে না। তখন দু টাকা সের মাংস ছিল। টাকা ফুরিয়ে যাবার ভয়ে তারা একদিনও কেনেনি।

পরামর্শটা অবিনাশ কাকার দেওয়া—অনন্ত কোন কাজে ঢুকে যাক। সংসারে এবার টাকা রোজগারের লোক দরকার। ঘষতে ঘষতে বি. এ., এম. এ পাশ করে ত বড়জোর কেরানী হবে, তার থেকে, যেহেতু ওর মাথাটা অমরের মত পরিষ্কার নয় তাই এখনি যে কোন ধরনের কাজে অনন্ত লেগে পড়ুক। পঞ্চাশ-ষাট, যত টাকাই আনুক সেটা সাহায্য করবে। পাঁচ-পাঁচটা লোকের খাওয়াপরা, সহজ কথা নয়।

শীলা আপত্তি করেনি। দিনযাপনের চিন্তায় ও অভাবে ধীরে ধীরে তার বাস্তব বুদ্ধি বেড়েছে সেই সঙ্গে অবিনাশ-ঠাকুরপোর উপর নির্ভরতা। অনন্তকে কাজে ঢুকিয়ে দেবার কথায় শুধু একবারমাত্র সে বলেছিল, "এখন ত ওর খেলাধুলো করার বয়স।"

"তা বললে ত হয় না, ওর বয়সী কত ছেলে দেখুনগে কত কাজ করছে। ট্রেনে জিনিস বেচছে, দোকানে কাজ করছে, মোট বইছে ....ওর থেকেও কম বয়সী।"

অবিনাশ কাকা মাথা নিচু করে বসে-থাকা অনন্তের পিঠে হাত রেখেছিলেন। কথাগুলো খুব স্বচ্ছন্দে বলতে চেষ্টা করেও পারছিলেন না। গলায় আটকে যাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে খাঁকারি দিতে থামছিলেন।

"বড় ছেলেরাই ত এক সময় সংসারে বাবার জায়গা নেয়। স্কুলে যাওয়া, খেলাধুলো, আড্ডা এসবের দরকার আছে কিন্তু ভাগ্য যদি অন্যরকম অবস্থায় ফেলে দেয়, তাহলে আর কি করার থাকতে পারে। মা'কে দেখা, ভাইবোনেদের মানুষ করে তোলা, নিজেকে নিজে বড় করা এসব ত এবার তোকেই করতে হবে। জীবনে ত্যাগ করতে হয় নানাভাবে, সবাইকে করতে হয়। .... কি আর করবি, ভাগ্য যার যেমন দেবে ...।"

শুনতে শুনতে অনন্ত নিজেকে বাবার ভূমিকায় কল্পনা করে অভিভূত হয়ে গেছল। বাবা গ্র্যাজুয়েট, বয়সে তার থেকে অন্তত তিরিশ বছরের বড়, চাকরি করছিলেন প্রায় কুড়ি বছর, একটা সংসার তৈরি করেছেন, অনেক ঝাপটা সামলে তাদের নিয়ে এগোচ্ছিলেন, এমন একটা লোকের জায়গা সে নেবে কি করে?

অমর, অনু, মা সবার মুখের দিকে সে তখন তাকিয়েছিল। ওরা ঘরে ছড়িয়ে বসেছিল। চল্লিশ ওয়াটের বাল্বে ওদের ভয় ভাবনা দুঃখ আরও বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। ওরা মাঝে মাঝে মুখ নামাচ্ছে আর সন্তর্পণে তার দিকে তাকাচ্ছে। যেন বিচারসভায় বসে ওদের হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনছে এমন একটা ভাব চোখেমুখে।

নিজেকে বিরাট একটা মানুষ হিসেবে দেখার ইচ্ছা অথবা লোভ অনন্তের মাথার মধ্যে তখন ঢুকে যায়। সর্বস্ব ত্যাগ করে, আরাম বিশ্রাম সুখ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে সে ভাইবোনেদের বড় করে প্রতিষ্ঠিত করছে, নিজে যাপন করছে সামান্য জীবন। ভাল জামা-প্যান্ট পরে না, সিনেমা দেখে না, রেস্টুরেন্টে খায় না, ট্যাক্সি চাপে না, কারুর কাছে হাতও পাতে না। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী শ্রদ্ধাভরে তার দিকে তাকাচ্ছে, তার সম্পর্কে প্রশংসা করছে—কল্পনা করতে গিয়ে সে ঘরের সবকটি মানুষের জন্য ভালবাসা আর করুণাবোধ করছিল।

"আমি সবাইকে দেখব।"

"য়্যা!" অমর হঠাৎ অবাক হয়ে শব্দ করে ফেলেছিল।

"তোদের আমি দেখব।"

ওরা তিনজন কি বুঝল কে জানে, মা'র চোখ শুধু জলে ভরে উঠেছিল।

"তুই সুখী হবি, দেখিস আমি বলছি, ...জীবনে তুই কখনও কষ্ট পাবি না।"

রেবতীর চিঠিটা আবার ডালার খোপে রেখে অনন্ত হাসবার চেষ্টা করল। রেবতী গত পরশু তাকে ছেড়ে চলে গেছে খবরটা কেউ এখনও জানে না।

মা-কে দেড় বছর আগে দিল্লি নিয়ে গেছে অমর। অনুর বিয়ে হয়েছে কটকে এক স্যাকরার সঙ্গে। তাকে সে সাত বছর দেখেনি। পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে খুবই ব্যস্ত। অনুর বিয়েতে সবাই অমত করেছিল, কিন্তু সে জেদভরেই বোনের বিয়ে দেয়। শান্তনু পড়ত অলুর সঙ্গে কলেজে। বেকার ছিল। আজও প্রায় তাই। শান্তনু দু-বার চাকরি খুইয়েছে মাতলামো করে। এখন চাকরি খুঁজছে। অলু ফুড কর্পোরেশনে চাকরি করে। তাদের দুটি ছেলে।

কারুর সঙ্গেই অনন্তের দেখা সাক্ষাৎ নেই। দায়সারা বিজয়ার প্রণাম সে পায় বটে, সকলের ঠিকানায় জবাবও দেয় কিন্তু ওই পর্যন্তই। অলু কলকাতায় থাকে অথচ তার সঙ্গে তিন বছর দেখা হয়নি। অবিনাশ কাকা রিটায়ার করে তাঁর দেশের বাড়িতে চলে যান, সেখানেই আছেন। ব্লাড প্রেসারের রোগী, মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে শেষবারের মত দেখে যেতে বলেন।

রেবতীর চলে যাওয়ার খবরটা জানাবার মত লোক আছে শুধু মা। তার বিয়ের ব্যাপারে মা ছাড়া কেউ আর আগ্রহ দেখায়নি। অবশ্য ছেলেকে গৃহী দেখতে কোন্ মা না চায়!

আলো নিবিয়ে অনন্ত খাটে পা ঝুলিয়ে বসল।

অন্যরা শুনলে কি বলবে? বোনেদের না জানিয়েই সে বিয়ে করেছে। তবু কিভাবে যেন ওরা জেনে গেছল। অলু একদিন ঘন্টাখানেকের জন্য এসেছিল রেবতীকে দেখতে। বাসে তুলে দিতে যাবার সময় অলু বলেছিল, "বউয়ের বয়স হয়েছে। পছন্দ করেই যখন বিয়ে করলে, কমবয়সী করলে পারতে।"

"কত আর বয়স, তিরিশের নিচেই।"

আড়চোখে সে দেখেছিল, অলুর ঠোঁট মুচড়ে গেল।

"তিরিশের নিচে! আমার থেকে অন্তত দু-তিন বছরের বড় বই কম নয়।"

অলুর জন্মসাল ধরে অনন্ত হিসেব করল।

"তোর এখন একত্রিশ?"

"হ্যাঁ। তিন মাস পর বত্রিশে পড়ব।"

"আমারও ত উনচল্লিশে পড়ার কথা। বয়সের ফারাক খুব একটা কি?"

"আর দুদিন বাদেই ত বুড়ি হয়ে যাবে।"

"হোক্, শরীরই কি স্বামী-স্ত্রীর জীবনে সব? তাছাড়া আমিও ত বুড়ো হয়ে যাব।"

তার কথার ভঙ্গিতে ও স্বরে গভীর শান্ততা এবং জীবনের উপর সহজ ভরসা প্রকাশ পেয়েছিল।

"ভাগ্যে যা আছে তা হবেই।"

অলু চুপ করে থাকে।

"তোর বোধহয় পছন্দ হয়নি বউদিকে।"

"না না, পছন্দ হয়নি কে বলল? বেশ সুন্দরী, ফিগারটিও চমৎকার। আমি ত প্রথমে দেখে অবাকই হয়ে গেছলুম। তুমি এমন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ভাব করলে কি করে? চিরকালই ত মেয়েদের দেখলে কুঁকড়ে সরে যেতে।"

অনন্ত অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। অলুর দিকে তাকিয়ে গালভরা হাসি নিয়ে বলেছিল, "তোরা ত আমাকে বোকা ছাড়া আর কিছু ভাবিস না।"

"মোটেই না। ছোড়দা আর অনু ভাবতে পারে আমি কোনদিন ভাবিনি। ... তুমি ওদের কোন খবর পাও?"

"না।"

"ভাবছি একবার দিল্লি যাব। ছোড়দা যদি ওর একটা কাজকম্মের ব্যবস্থা করে দিতে পারে।"

"শান্তনু এখন খায়টায়?"

"ও জিনিস কি আর ছাড়া যায়।"

"ওর স্বাস্থ্য এখন কেমন ?"

"ভাল না, রক্ত আমাশায় ভুগছে।"

"খুব খারাপ রোগ।"

"দাদা অনেকের জন্য ত অনেক করেছ, আর একটু কর না।"

"আমি আবার কার জন্য কি করলুম। ভাগ্যে যা আছে তাই হয়েছে।"

"শ' পাঁচেক টাকা আমায় দেবে ?"

"পাঁ-চ-শ, কোথায় পাব !"

"ওরা তোমায় কিছু দেয়নি ?"

"শ্বশুরবাড়ি ? আরে দূর, দেবার মত কেউ থাকলে ত দেবে। তিন বোন একটা ছোট ভাই, আমাদের মতই বাবা নেই।"

"তোমার কাছে নেই ?"

"এখনই .... খুবই দরকার ? কবে চাই ?"

"আজ পেলে আজই।"

"যোগাড় করতে হবে।"

অলুকে বাসে তুলে দিয়ে ফেরার সময়, 'চিরকালই ত মেয়েদের দেখলে কুঁকড়ে সরে যেতে' কথাটা নিয়ে সে মনে মনে খুব হেসেছিল। কেউ জানে না, সতের-আঠার বছর আগে সে একজনকে দারুণ ভালবেসেছিল। গৌরী নাম। এখন সে কোথায় থাকে কে জানে।

বাড়ি ফিরতেই রেবতী বলেছিল, "কিছু বলল কি তোমার বোন ?"

"কি বলবে ?"

"আমার সম্পর্কে। নতুন মানুষ দেখলে মেয়েরা মন্তব্য না করে কি থাকতে পারে ?"

"তোমার ওকে পছন্দ হয়নি ?"

"যেভাবে হাঁড়ির খবর নিচ্ছিল ....তোমার আর এক বোনের নাকি অবস্থা খুব ভাল, কটকে থাকে ?"

"শুনেছি, আমি ঠিক জানি না।"

রেবতী 'তোমার বোন', 'তোমার মা', 'তোমার ভাই' এইভাবেই বলে। কখন 'মা', 'ঠাকরঝি', বা ' ঠাকরপো' ওর মুখ থেকে বেরোয়নি। অনন্ত একবার বলেছিল, "আমার মা এখন তোমারও মা।"

"আগে ত দেখি তারপর মা ডাকব।"

রেবতীর শুকনো নিস্পৃহ স্বর বুঝিয়ে দিয়েছিল সে সহজে সম্পর্ক পাতাতে অনিচ্ছুক। অনন্ত কখন জোর দেয়নি। সে নিঃসঙ্গতা থেকে রেহাই পেয়েছে, এতেই সে খুশি এবং সুখী।

এখন তার সুখ ধ্বংস হয়ে গেছে। জানাজানি হলে সে মুখ দেখাবে কি করে ? যে শুনবে প্রথমেই সে বলবে, 'কার সঙ্গে বেরিয়ে গেল ?' কিংবা 'কোথায় গিয়ে উঠেছে ?'

অনন্ত জানে কোথায় গেছে। চিঠিতে কিছু বলেনি বটে কিন্তু সে অনুমান করছে রেবতীর পিছনে আছে দিলীপ ভড় নামে সেই-লোকটি যাকে বিয়ের আগে রেবতী পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, "এই হচ্ছে দিলীপদা, অনেক উপকার করেছে আমাদের। দিলীপদা না থাকলে আমাদের পরিবারটা ভেসে যেত। .... আর ইনি হচ্ছেন সেই ভদ্রলোক কাগজে 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।"

"ওহ্ আপনি !"

অনন্ত নমস্কার করেছিল, লোকটি না-দেখার ভান করে সিগারেটের বাক্সটা এগিয়ে দেয় তার দিকে। অনন্ত হাত জোড় করে বলে, "মাফ করবেন, খাই না।"

সিগারেট কেন সুপুরিও সে খায় না। অবিনাশ কাকা বলেছিলেন, "এখন থেকে টাকা জমানো ওভ্যেস কর। আজেবাজে সিনেমা দেখে, রেস্টুরেন্টে খেয়ে, প্যান্ট-জামা-জুতোয় কি পান-সিগারেটে টাকা ওড়াসনি। মনে রাখিস তিনটে ভাইবোন, মা তোর জিম্মায়।"

অনন্তের বয়স তখন আঠার। অবিনাশ কাকা প্রথম দিন তাকে বই বাঁধাইয়ের দোকানটায় পৌঁছে দিয়ে মালিক প্রসাদ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর, কথাগুলো বলেন।

"কিছুই ত কাজ জানে না, তবে শক্তিবাবুর ছেলে বলেই নিচ্ছি, এখন পঁয়ত্রিশ টাকা দোব, শিখুক, কাজ শিখলে তখন বাড়াব।"

"পঁয়ত্রিশ, বড্ড কম। একটু বাড়ান, পঞ্চাশ করুন।"

অবিনাশ কাকা আধ ঘন্টা কষাকষি করে চল্লিশ টাকায় প্রসাদ ঘোষকে রাজি করান।

"আপনার অফিস ত আর সেরকম কাজকম্ম দিচ্ছে না। সেই কবে ছ-মাস আগে একটা চার হাজার টাকার কাজ শেষ পেয়েছিলুম তারপর হাঁটাহাঁটিই সার হল। স্টোরকিপারকে ত ফাইভ পার্সেন্ট দিয়েছি, আরও একটা পার্সেন্ট বাড়াতে রাজি।"

"আমি কালই কথা বলব সুনির্মলবাবুর সঙ্গে। শক্তিদার ছেলের উপকার হবে শুনলে নিশ্চয় কিছু কাজ করবে।"

চার দিনের মধ্যে দু-হাজার টাকার কাজ পেয়েছিল কমলা বাইণ্ডার্স। সকাল আটটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত কাজ। প্রথম দিন অনন্ত মুশকিলে পড়েছিল দুপুরবেলায়। খিদেয় পেটে মোচড় দিচ্ছিল কিন্তু পকেটে পয়সা নেই। পাঁচজন দফতরিই বাড়ি থেকে রুটি ভাত এনে খায়। যেদিন আনে না কাছেই রাস্তার চায়ের দোকানে পাঁউরুটি আলুর দম খেয়ে নেয়।

অনন্তকে কাজ দেওয়া হয়েছিল পরেশ দাস নামে প্রৌঢ় কারিগরটির সঙ্গে। শীর্ণ, কুঁজো লোকটির বিরাট এক কোরণ্ড মালকোঁচা দিয়ে ধুতিতে সেটি আঁট করে বাঁধা, পরনে ছেঁড়া গেঞ্জি। সে লক্ষ্য করেছিল অনন্ত বাড়ি থেকে খাবার আনেনি। দুটি রুটির উপর আলুছেঁচকি রেখে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, "খাও। পেট ভরবে না জানি তবু সারাদিন খালি পেটে থাকা ভাল নয়।"

সে লজ্জায় পড়ে গেছল। নিতে রাজি হয়নি। পরেশ দাস দু-বার অনুরোধ করে নীরবে রুটি চিবিয়ে খায়।

"মালিক কত দেবে বলেছে।"

"চল্লিশ টাকা।"

"বাড়িতে খেতে গেছে। এলে আট আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে খেয়ে নিও। লজ্জা কোর না, আগাম বলে চাইবে।"

প্রসাদ ঘোষ ফিরে এল আধঘন্টা পর। কিন্তু সে আট আনা চাইতে পারেনি। সে ভেবে দেখেছে সকাল থেকে ঝাঁট দেওয়া, টিউবওয়েল থেকে কলসিতে জল ভরা ছাড়া শুধু কয়েকটা পুরনো পাঠ্য বইয়ের মলাট খুলেছে আর কয়েকটা বোর্ডে লেই মাখিয়েছে। এই কাজের জন্য হয়ত আট আনা প্রাপ্য হয় কিন্তু এখুনি হাত পাতলে মালিক কি ভাববে তার সম্পর্কে তাদের পরিবার সম্পর্কে ? হাঘরে ভিখিরি ! আট আনাও পকেটে রাখার সামর্থ্য নেই !

সে আর চাইতে পারেনি। সারাদিন কয়েকবার জল খেয়েছিল। রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ফ্রকপরা একটি মেয়েকে সে চা তৈরি করতে দেখে। সর্বাগ্রে তার নজরে পড়ে আঁটো ফ্রকের ভিতর থেকে স্তনের দৃঢ়তা ফুটে রয়েছে। আবলুস রঙের চামড়া। ঘাড় পর্যন্ত চুল। মুখটি মিষ্টি। চাহনিতে চঞ্চলতা। দুদিন পর দুপুরে বেঞ্চে বসে আলুর দম কিনে রুটি দিয়ে খেতে খেতে সে চাওয়ালাকে বলতে শুনল, "গৌরী, উনুন কামাই যাচ্ছে, মটরগুলো সেদ্ধ কর।"

সেদিন মধ্যরাত পর্যন্ত সে ঘুমোতে পারেনি। শরীরে অদ্ভুত একটা অস্বস্তি চলাফেরা করেছিল।

অনন্ত আজ রাতেও আর এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করছে তবে শুধুই মাথার মধ্যে। এঞ্জিনের পিছনে মালগাড়ির মত সার সার চিন্তা মাঝে মাঝেই লাইন বদলে অন্য লাইনে চলে যাচ্ছে। সে রেবতীর কথাই ভাবতে চায় কিন্তু তার কৈশোর আর প্রথম যৌবন বারবার তার চিন্তাকে থামিয়ে দিচ্ছে লাল সিগন্যালের মত।

দিলীপ ভড় রেবতীদের ঘরের তক্তাপোশে পা ছড়িয়ে একটা বালিশ বগলে রেখে কাত হয়ে শুয়েছিল। সিগারেটের ছাই পড়ছিল মেঝেয়। রেবতীর ছোটবোন শাশ্বতী ওর পায়ের কাছে বসেছিল, একটা হাত দিলীপ ভড়ের পায়ের উপর আলতো করে রেখে অনন্তকে দেখছিল কৌতূহলে। অনন্ত তখন ভাবছিল এই লোকটা কে ? নিকট আত্মীয় ?

"কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন কেন ?"

"তাছাড়া উপায় ছিল না।"

"সম্বন্ধ করে বিয়ে দেবার মত কেউ নেই ?"

"না।"

অনন্ত হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। কেউ নেই বলাটা ঠিক হল কি ? দুটো বোন, একটা

ভাই আর মা থাকা সত্ত্বেও তার কেউ নেই। সবাই দূরে দূরে। তাকে ফেলে মা যেতে চায়নি। কিন্তু থেকেও কোন লাভ হত না। পেটের যন্ত্রণায় কাতরাত আর বিড়বিড় করত : "ভগবান, ভগবান, আর পারছি না গো। এবার নিয়ে যাও আমায়।" দেখাশুনো করার লোক রাখারও সামর্থ্য নেই। রান্না, বাসনমাজা, কাচাকাচি সংসারের যাবতীয় কাজ অনন্ত নিজেই করত। মাঝে-মধ্যে অলু এসে কিছুক্ষণ থেকে চলে যেত। পাড়ায় ছিল মেয়ে ডাক্তার মাধবী দত্ত। তিনি দেখে বলেছিলেন, "হাসপাতালে ভর্তি করান, মনে হচ্ছে ক্যান্সার।"

অনন্ত সেইদিনই অমরকে চিঠি দিয়েছিল। চার দিনের মাথায় অমর দিল্লি থেকে উড়ে এসে উঠল অফিসের গেস্ট হাউসে। মা-কে সে পরদিনই বড় ডাক্তার দেখিয়ে এক্স-রে করায়। "মা-কে নিয়ে যাব ট্রিটমেন্ট দিল্লিতেই করাব।"

"থাক্ না এখানে।"

"অপারেশন করে একটা চেষ্টা করা যাক। এখানে থেকে লাভ কি ? দেখার লোক নেই, তাছাড়া খরচও অনেক।"

"শুনেছি এ রোগে কেউ বাঁচে না।"

অমর জবাব দেয়নি। সন্ধ্যার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নিচুস্বরে কথা বলছিল। অমরের মুখ থেকে সে হাল্কা মদের গন্ধ পাচ্ছে। মা ভিতরে দালানে বসে রয়েছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে।

"মরবেই যদি তাহলে এখানেই মরুক না। আবার টেনে হিঁচড়ে অত দূরে নিয়ে গিয়ে কি লাভ !"

"অপারেশন করলে আরও কিছুদিন কয়েক মাস কি একটা বছর টিকে যাবে। পারবে তুমি ? ওষুধপত্তর ধরে কম করেও হাজার আষ্টেক টাকা, পারবে ?

অনন্ত অসহায় বোধ করল। ব্যাঙ্কে তার সাড়ে সাত হাজারের মত টাকা জমেছে। ক্যান্সার রোগীর জন্য টাকা খরচ আর ভস্মে ঘি ঢালা একই ব্যাপার। কিন্তু বিনা চিকিৎসায় মা মারা যাবে ? হতে পারে না। জীবনবীমা করেছে কুড়ি হাজার টাকার। তার মাইনে এখন কেটে কুটে ছ'শ একানব্বুই টাকা। অমর কত টাকা রোজগার করে তা সে জানে না। হয়ত সাত-আট হাজার মাইনে পায়। বার চারেক ত বিদেশ ঘুরে এসেছে।

"চেষ্টা করে দেখি। অফিস কো-অপারেটিভ থেকে নয় লোন নেব।"

"ভাল। পরশু সন্ধ্যের ফ্লাইটে আমি চলে যাব।"

পরশু সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে সে দেখল দরজায় তালা ঝুলছে। তার পায়ের শব্দে দোতলা থেকে কাকীমা চেঁচাল, "কে ?"

"আমি অনন্ত।"

"চাবিটা নিয়ে যাও।"

অনন্ত দোতলায় উঠে এল। জ্যেঠিমা পুজোর ঘরে। কাকীমা, ঠিকে-ঝি আরতি,

পাশের বাড়ির দু'জন গৃহিণী দালানে টি. ভি. দেখছে।

"ওই পেরেকে টাঙানো রয়েছে। বিকেলেই ওরা গেল। দিদি খুব কাঁদছিলেন, তোমার সঙ্গে আর দেখা হল না।"

শোবার ঘরে টেবলে চিরুনি চাপা দেওয়া এক টুকরো কাগজ। তাতে বড় অক্ষরে লেখা : "দাদা, মা-কে নিয়ে যাচ্ছি, আমার কাছে শেষ কটা দিন থাকবে। রাগ কোর না। ইতি—অমর।"

বারকয়েক পড়ে সে থম্ হয়ে বসে থাকে। মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে বাচ্চাছেলের মত কেঁদেছিল। দেড় বছর আগে লিখে রেখে যাওয়া অমরের চিঠিটা ট্রাঙ্কের মধ্যে এখনও রয়েছে। মা এখন জীবিত।

অনন্ত বিছানায় পাশ ফেরার সময় মুখে একটা শ্রান্তির শব্দ করল। সারাটা জীবন শুধু খাটুনি আর খাটুনি। এইবার সে একদমই একা। রেবতী পরশু চলে গেছে। কোন ঝগড়া হয়নি, সামান্য তর্কাতর্কিও নয়। এমনিই চলে গেছে। পাঁচ মাস আগে তাদের বিয়ে হয়েছে।

কিভাবে সে পরিচিতদের কাছে মুখ দেখাবে! জ্যেঠিমা আজ সকালে জিজ্ঞাসা করেছিল, "বউমা কোথায়, বাপের বাড়ি গ্যাছে?"

"হ্যাঁ।"

অমরের মত ছোট্ট কাগজে অল্প কয়েকটা অক্ষর : "আমার আর ভাল লাগছে না। চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না। রেবতী।"

মা বলেছিল, "তুই সুখী হবি, দেখিস ....আমি বলছি। জীবনে তুই কখনও কষ্ট পাবি না।"

কবে বলেছিল, মা কবে বলেছিল কথাটা? ভাবতে ভাবতে অনন্ত ঘুমিয়ে পড়ল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

॥ ৩ ॥

মাইনের দিনে শক্তিপদ তারা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে কচুরি কিনে বাড়ি ফিরত। গোনাগুনতি মাথাপিছু চারটি অর্থাৎ চব্বিশটি। একবার সবাইকে ভাগ করে দিয়ে দেখা গেল একটি বেশি। পকেট থেকে খুচরো নোট ও পয়সা বার করে শক্তিপদ গুনে দেখল চব্বিশটির দামই সে দিয়েছে। দোকানী তাহলে ভুল করে একটি বেশি দিয়ে ফেলেছে। 'ফেরত দিয়ে আসি।' কচুরিটা কাগজে মুড়ে সে তখুনি রওনা হয়ে গেছল। শীলা তখন বলেছিল, "পরে যেও, আগে খেয়ে নাও।" শক্তিপদ জবাব দেয়নি। অমর অস্ফুটে বলেছিল, "ফেরত দেবার দরকার কি? মিষ্টিওলাও ত কত লোককে ঠকায়।"

প্রথম মাইনে পেয়ে বাড়ি ফেরার সময় অনন্ত তারার দোকানের সামনে দাঁড়াল। দোকানের ভিতরে কয়েকজন খাচ্ছে। ক্ষীণ গন্ধ আসছে কচুরি ভাজার। ফুলকো গরম কচুরিতে আঙুলের টোকা দিয়ে গর্ত করছে একজন। কচুরি নিয়ে বাবা যখন বাড়ি পৌঁছত তখন ঠাণ্ডা হয়ে যেত। বেশিরভাগই চোপসান। অনন্ত কানে কানে মা-কে বলত, "ফুলোগুলো কিন্তু আমার।" আঙুল বসিয়ে গর্ত করে সে তারমধ্যে তরকারি ভরে দিত।

অনন্ত পায়ে পায়ে কাঁচের শো-কেসের সামনে এল। পকেটে চারটে দশ টাকার নোট মুঠোয় চেপে ধরে সে গলা থেকে স্বর বার করতে পারল না। দোকানী তার দিকে তাকিয়ে বলল, "কি দোব?"

"কচুরি।"

"কটা?"

"চব্বিশটা।" আপনা থেকেই সংখ্যাটা তার মুখে এসে গেল।

"দু মিনিট দাঁড়াতে হবে, ভেজে আনছে।"

অনন্ত অপেক্ষা করতে করতে রোমাঞ্চ বোধ করল। ব্যাপারটা ঠিক বাবার মতই হচ্ছে। বাড়িতে নিশ্চয় সবাই অবাক হয়ে যাবে। বাবাকে তখন সবার মনে পড়বে। ভাববে, সংসারের শূন্য স্থানটা এবার পূর্ণ হল। সবাই অন্যরকমভাবে তাকে দেখবে।

তার বুকের মধ্যে একটা উচ্ছ্বাস ঠেলে উঠছে। রাস্তার যানবাহন, লোকের চলাচল, কোলাহল, নানান শব্দ, ভঙ্গি, সব তখন অনন্তের ইন্দ্রিয়ের পরিধি থেকে সরে গেছে। সে শুধু দেখতে পাচ্ছে বাবাকে, একহাতে তরকারির ভাঁড় অন্যহাতে কচুরির ঠোঙা, ঈষৎ ঝুঁকে, শুধুমাত্র রাস্তার দিকে তাকিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সামনে মানুষ থাকলে একবার মুখটা তুলেই পাশ কাটিয়ে নিচ্ছে।

"চব্বিশটা কচুরি।"

"চব্বিশটা, ঠিক গুনেছেন ত?"

"কম নেই।"

দশ টাকার নোট কাঁচের উপর রাখল। তার প্রথম উপার্জন, প্রথম খরচ। খুচরো

নোটগুলো পকেটে রাখার সময় তার মনে হল সবাইকে মিষ্টিমুখ করান উচিত।

"পাঁচটা কড়াপাক সন্দেশ দিন।"

"আট আনার না এক টাকার ?"

"আট আনার।"

বাবা কোনদিন সন্দেশ আনেনি। তাহলে কি নেওয়া ঠিক হবে ? অনন্ত দ্বিধায় পড়ল। বাবাকে কি ছোট করা হবে ? তা'ত সে চায় না। প্রথম চাকরির প্রথম মাইনে পেয়ে বাবা কি বাড়ির লোকেদের মিষ্টিমুখ করায়নি ? জীবনে ত শুধু একবারই। এতে নিশ্চয় দোষ হবে না।

পকেটে সন্দেশের ঠোঙা, দু-হাতে কচুরি ও তরকারি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার তার হাসি পেল। ইচ্ছে করেই অল্প কুঁজো হয়ে রাস্তার দিকে মুখ নামিয়ে সে কিছুটা হাঁটল। এখন তার পকেটে যে-ক'টা টাকা, তার অন্তত কুড়িগুণ থাকত বাবার পকেটে। বাবার সমান হতে কি তার কুড়ি-বাইশ বছর লাগবে ?

রাস্তার উপর চুণ দিয়ে গোলাকার বৃত্ত আঁকা। রবারের বল খেলা হয়েছে বিকেলে। গোলকিপারের এলাকা চিহ্ন করেও দাগ টানা। সে মাঝেমাঝে গোলকিপার হয়েছে। কোন খেলাতেই তার দক্ষতা নেই। অমরকে সবাই দলে চায়। অন্য পাড়াও তাকে ফুটবল বা ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নিয়ে যায়।

সদর দরজা ভেজান। পা দিয়ে ঠেলে খুলতেই আবছা অন্ধকার উঠোনে দেখতে পেল পিছন ফিরে মা সাবান কাচছে। ডাকতে গিয়েও ডাকাল না। পা টিপে সে মা'র পিছনে এল। ঝুঁকে ঘাড়ের কাছে মুখ নামাল।

"হাল-লুম্।"

"বাবা গো!"

শীলা কেঁপে উঠে পিছনে তাকিয়ে দেখল অনন্ত ঠোঙা আর ভাঁড় তুলে হাসছে।

"এরকম করে ভয় দেখায়।"

"আমি ত হালুম করেছি! বাঘ এখানে আসবে, তাই ভেবেছ ? এই দ্যাখো।"

শীলা ভ্রূ কুঁচকে অবাক হয়ে তাকিয়ে।

"কি রে ?"

"বাবা যা আনত।"

"আজ মাইনে দিল বুঝি! ঘরে রাখ আসছি। ঠাকুরপো তোর জন্য অনেকক্ষণ বসে রয়েছে।"

অনন্ত ঘরে ঢুকতেই সবাই তার হাতের জিনিসদুটোর দিকে চোখ রাখল। পাতলা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। ঠোঙা আর ভাঁড়টা কোথায় সে রাখবে ভেবে পাচ্ছে না। মেঝেয় বই নিয়ে অলু আর অমর। তক্তাপোশে অনু। অবিনাশ চেয়ারে বসে মন দিয়ে অমরের ভূগোল বইটা পড়ছে।

"কাল অফিসে এসেছিল তোদের মালিক। আস্ত ঘুঘু...হাতে কি ?"

"কচুরি।"

"মাইনে দিয়েছে ? মহা ধড়িবাজ, বলে কিনা আমার ত লোকের দরকার নেই, আপনি বললেন তাই ছেলেটাকে রাখলুম, খরচ বেড়ে গেল। আসলে মতলব এইসব বলে যদি আরও কিছু কাজ পাওয়া যায়। সুনির্মলবাবুকে বললুম সব। তিনি ত রেগে উঠে বললেন এখান থেকে যথেষ্ট কাজ পেয়েছে, শুধু শক্তিবাবুর ছেলের জন্যই ওকে কাজ দিয়েছি নইলে দিতুমই না। তোর সঙ্গে ব্যবহার করে কেমন ?"

"ভাল।"

"কাজ শিখেছিস কিছু ? এক মাস ত হল।"

"অল্পস্বল্প, শক্ত কাজ ত নয়।"

ঘরে ঢুকল শীলা। তার চোখ ঝকঝক করছে। ঠোঙাটা তুলে নিয়ে বলল, "কি দরকার ছিল এসব আনার, আজেবাজে পয়সা নষ্ট।"

মায়ের আনন্দ কারুর কাছেই চাপা রইল না। শীলা একটা কাঁসার থালায় তরকারির বেশির ভাগ ঢেলে চার ভাগ করল, আর একটা প্লেটে বাকিটা তুলে অবিনাশের হাতে দিল। কচুরির ঠোঙাটা অনন্ত বাড়িয়ে দিল অমরের সামনে, "চারটে। সবার জন্য চারটে করে।"

ঠিক এইভাবেই তার বাবা বলত। ঠোঙা থেকে চারটে কচুরি তুলে সে অবিনাশের প্লেটে রাখল।

"তোর কই ?"

"আমার আর মা'র আছে। আগে বরং একটু মিষ্টিমুখ হক।"

ম্যাজিসিয়ানের মত হাত নেড়ে অনন্ত পকেট থেকে এক ঝটকায় সন্দেশের ঠোঙা বার করল।

"জীবনের প্রথম রোজগার। তবে এরপর আর এভাবে খরচ করা নয়।"

অবিনাশ স্মিত হেসে বললেও স্বরে কিছুটা ভর্ৎসনা ছিল।

"হ্যাঁ, আর নয়।" শীলা প্রতিধ্বনি করল। "তোরটা এখুনি খেয়ে নে, রেখে দিলে আর থাকবে না। যা সব...আমার ক'দিন ধরেই অম্বল হচ্ছে ভাজাটাজা আর খাব না।"

"তাহলে আমায় দাও।" অমর হাত বাড়াল। অনন্ত তার হাতে একটা কচুরি দিল, দুই বোনকেও। অবিনাশ হাতটা তুলে তাকে দিতে নিষেধ করল।

অনন্ত ভাইবোনেদের মুখের দিকে তাকাল। এই মুহূর্তে সারা ঘর স্থির একটা নিশ্চিন্তিতে ডুবে গেছে। সবার মুখেই সুখের বুড়বুড়ি। অমর কচুরির সামান্য একটু ছিঁড়ে তরকারির ঝোলে বুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে চিবোচ্ছে, মাঝে মাঝে দু-চোখ বুঁজে আসছে। অনু আঙুলের ডগায় ঝোল মাখিয়ে জিবে ঠেকাচ্ছে। অলুর চোখ দ্রুত চিবোনর জন্য বড় হয়ে উঠেছে আর ঢোক গিলছে। বহুদিন পর তাদের ঘরে কিছুক্ষণের জন্য বাবা ফিরে এল। 'বড়ছেলেরাই ত একসময় বাবার জায়গা নেয়', আজ থেকে সে বড় হয়ে গেল। এখন তার আঠার চলছে।

অনন্ত রাত্রে স্নান করে জলকাচা পাজামাটা উঠোনের তার-এ মেলে দিছিল। শীলা কাছে এসে নিচুস্বরে বলল, "ওরা আজ ভাড়া চেয়েছে, একসঙ্গে চার মাসেরই।"

অনন্ত চুপ করে রইল।

"একগাছা চুড়ি বিক্রি করলে ভাড়াটা মেটান যায়।"

"অনু অলুর বিয়ের জন্য রাখবে বলেছিলে।"

"ওদের বিয়ের বয়স হতে এখনও সাত-আট বছর বাকি। ততদিনে টাকা যোগাড় হয়ে যাবে। তের হাজার টাকা ত রয়েইছে।"

"ততদিনে সোনার দামও তেরগুণ হয়ে যাবে।"

"তাহলে ? উনি প্রতি মাসে ঠিক সময়ে ভাড়া পাঠিয়ে দিতেন, কোনবার দেরি করেননি। এই প্রথম বাকি পড়ল তাও চারমাসের।"

"এরকম দু-চার মাস বাকি সব ভাড়াটেদেরই পড়ে।"

"আমাদের কখন পড়েনি।"

দুজনে চুপ করে রইল। দোতালায় রেডিও থেকে পল্লীগীতি ভেসে আসছে। নর্দমা থেকে একটা ছুঁচো উঠোনে লাফিয়ে উঠে শীলার পা ঘেঁষে ছুটে গেল। দূরে কোন্ বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছে।

"একটা কথা বলব, রাগ করবি না ?

"কি কথা ?"

"খোকার মা আজ বিকেলে বলল, বলাই মিস্তির লেনের দাসেদের বাড়িতে রান্নার লোক খুঁজছে।"

"রাঁধুনি হবে !"

অনন্ত চাপা চিৎকার করে উঠল। তার হাতের আঙুলগুলো থরথর কাঁপছে।

"তুমি চিন্তা করতে পারলে ?...শেষকালে এমন একটা কাজের কথা...বাবা বেঁচে থাকলে তুমি একথা বলতে পারতে ?"

"উনি ত আর নেই।"

"আমাদের বংশ, মান-সম্মান ?"

"খেতে পরতে হবে, বাড়ি ভাড়া, এটা-ওটা, স্কুলের মাইনে...তুইও কি কখন ভাবতে পেরেছিলিস পড়া ছেড়ে চল্লিশ টাকার কাজ নিবি ?"

"আমি ব্যাটাছেলে, আমার সব মানিয়ে যায়....না, তোমাকে রাঁধুনি হতে হবে না।"

অনন্ত প্রায় ছুটেই ঘরে এল। দেয়াল ঘেঁষে অমর ঘুমোচ্ছে মেঝেতেই। তার পাশে বালিশটা ছুঁড়ে, আলো নিবিয়ে সে শুয়ে পড়ল। কিছু পরে সে পাশের ঘর থেকে মা'র কণ্ঠস্বর পেল, "কি বিচ্ছিরি শোয়া বাপু...ওদিকে পা সরা।"

অনন্তের ঘুম আসছে না। অজস্র রকমের চিন্তা তার মাথায় যাওয়া-আসা করছে। প্রত্যেকটাই ভয়ের আর হতাশার। মা রাঁধুনি একথা শুনলে পাড়ার লোকে কি বলবে, ওপরের লোকেরাও ? অলু, অনু, অমরের স্কুলে যেভাবেই হক অনেকেই জেনে যাবে।

ঝি-চাকর-রাঁধুনি মোটামুটি ত একই পর্যায়ের। কেউ যদি ওদের আঙুল দেখিয়ে বলে 'রাঁধুনির ছেলে...রাঁধুনির মেয়ে' ! ভাগ্য যাকে যেমন দেবে তা মেনে নিতেই হবে, কিন্তু তাই বলে মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে নাকি ?

গত এক মাসে সে বন্ধুদের বা পাড়ার লোকের সঙ্গে কথা বলেনি। পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলে ব্যস্ততার ভান করে হনহনিয়ে এড়িয়ে গেছে। স্কুলের অশোকবাবুর সঙ্গে একদিন রাস্তায় দেখা। এড়িয়ে যেতে গিয়েও পারেনি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "পড়া ছেড়ে দিলি ? করছিস কি এখন ?"

ইতস্তত করে সে বলেছিল, "অ্যাপ্রেন্টিস, কাজ শিখছি কারখানায়।"

"কিসের কারখানা ?"

অনন্ত তৈরি ছিল না প্রশ্নটার জন্য। সামনে নারায়ণ মেডিক্যাল হল-এ সাইনবোর্ডে চোখ পড়তেই বলেছিল, "ওষুধের কারখানা।"

"কত দিচ্ছে ?"

"একশ চল্লিশ টাকা।"

"অমরকে ভাল করে পড়াশুনো করতে বলিস, একটু খাটলেই ন্যাশনাল স্কলারশিপ পেয়ে যাবে।"

"আমি ত সারাক্ষণই বাইরে থাকি স্যার। আপনারা যদি ওকে বলেন...বাড়িতে ত বিশেষ পড়তে দেখি না।"

"মাথা আছে ওর, একটু খাটলেই পেয়ে যাবে, আমার কোচিং-এ ওকে আসতে বলিস...না না টাকা লাগবে না।"

অমর ক'দিন ধরে সকালে স্যারের কোচিং-এ যাচ্ছে। অমর বোধহয় জানে না সে কত টাকা পায় কমলা বাইণ্ডার্স থেকে। কিন্তু সে ওষুধের কারখানায় যে অ্যাপ্রেন্টিস নয় এটা অমর জানে। কথায় কথায় যদি অশোকবাবুকে বলে ফেলে দাদা কোথায় কাজ করে ! খুঁটিয়ে বাড়ির খবর নেওয়ার অভ্যাস স্যারের আছে।

ঘুমের মধ্যে সে ছটফট করেছে। ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর বিশ্রী একটা অস্বস্তি নিয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইল। অনু স্কুলে যাবে। মা বাসী রুটি আর তরকারি ওকে খেতে দিয়েছে। অমর এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। উঠোনে বাসন রাখার শব্দ হল। কাল কচুরি আর সন্দেশ কেনার পর যে-টাকা কটা ছিল সে মাকে দিয়েছে। মা'র কাছ থেকে দুটো টাকা নিয়ে এবার সে বাজার যাবে। খুব সহজে এবং দ্রুত তার বাজার করা হয়ে যায়। আলু, ডাল আর একটা আনাজ। মাছের বাজারের দিকেই সে যায় না। মাছ তারা শেষ কবে খেয়েছে ? মাসতিনেক আগে। হঠাৎ খুব ইলিশ ওঠে, পাঁচ টাকা কে জি পর্যন্ত দাম নেমেছিল। রাত্রে একটা আধ কেজি ইলিশ এনেছিলেন অবিনাশ কাকা। পরদিনের জন্য গোনাগুন্তি তুলে রাখা হয়েছিল। সকালে রাঁধতে গিয়ে মা একটা মাছ কম পায়। কেউই স্বীকার করেনি তবে সবাই সন্দেহ করেছিল এটা অমরেরই কাজ।

"আর ঘুমোয় না, ওঠ্ এবার, বেলা হয়ে গেল।" অনন্ত চোখ খুলে জানালা দিয়ে

তাকাল। সামনের বাড়ির দোতলার বারান্দায় উৎপলের দাদু চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছে। ওদের সদরের পাশেই আঁস্তাকুড় ছিল। দিন-সাতেক হল দাদু ঝিয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করে জঞ্জাল ফেলা বন্ধ করেছে। রোজ সকালে দাদু বারান্দায় বসে লক্ষ্য রাখে কেউ ওখানে কিছু ফেলছে কিনা। আরও তিনটে বাড়ি পেরিয়ে জঞ্জাল ফেলতে হওয়ায় ঝিয়েরা প্রথমে গজগজ করে এখন মেনে নিয়েছে। সকালে অনন্তদের জঞ্জাল ফেলে অনু। ওর স্কুল সাড়ে দশটা থেকে। ভাঙ্গা-কলাইয়ের থালা হাতে দূরে গিয়ে ফেলতে অনু লজ্জা পায়। তাই ও ঘরের জানালা থেকে প্রথমে দেখে নেয় দাদু বারান্দায় আছে কিনা। না থাকলে ছুঁটে গিয়ে ফেলে দিয়ে আসে। পাতের এঁটো-কাঁটা কিছুই প্রায় থাকে না, আনাজ খোসাসমেতই রান্না হয়, শুধু উনুনের কিছু ছাই ছাড়া তাদের সংসারে প্রতিদিনের কোন জঞ্জাল হয় না।

অনন্ত বাজারে বেরবার আগেই অমর কোচিং-এ চলে গেছে। খোকার মা উঠোনে নিচু গলায় শীলার সঙ্গে কথা বলছিল। তাকে দেখে ওরা কাজ বন্ধ করল। অনন্ত না-দেখার ভান করে পেরেক থেকে থলিটা তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "টাকা দাও।"

দুটো টাকা শীলার আঁচলে বাঁধা ছিল। খুলে দেবার সময় বলল, "খোকার মা-কে না বলে দিলুম। চাল শুধু এ-বেলার মতই আছে।"

অনন্ত অসহায়ভাবে তাকাল। বাবা মারা যাবার পর এক বছর কেটে গেছে। যে-কটা টাকা ছিল তাও ফুরিয়েছে। এখন তার চল্লিশটা টাকাই সম্বল। সে ভেবে পাচ্ছে না তাদের পাঁচটা পেট কিভাবে ভরবে।

"এবার থেকে দু-বেলা রুটি খেতে হবে।"

"আটা কিনতেও ত পয়সা লাগবে। মেয়েদের জামা মা কিনলেই নয়, সেলাই করে করে কত আর পরবে, অমরের জুতোটাও ফেলে দেওয়ার মত হয়ে গেছে..."

"তা আমি কি করব, শুধু আমায় বলছ কেন ?" অনন্ত হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। শীলা অবাকচোখে তাকিয়ে। এভাবে কখন ওকে চেঁচিয়ে উঠতে দেখেনি। দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। দুজনেই জানে উত্তর দেবার কিছু নেই, উত্তর হয় না। অনন্ত চোখ নামিয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল।

বাজার থেকে ফেরার সময় সে অমরকে দেখল বইখাতা হাতে তিনটি ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। ওর পায়ের কাবলি জুতোটার গোড়ালির চামড়ার পটিটা উল্টোন, বকলেস নেই। জুতোর কালো রঙ ধুলো-কাদায় ফ্যাকাশে। ডান পাটির একধারের সেলাই ছিঁড়ে আঙুল বেরিয়ে গেছে। অমরের বুশ শার্টটা ময়লা। ফুলপ্যান্টটা ঢলঢলে। দেখেই বোঝা যায় বহুদিন সাবানে কাচা হয়নি।

অনন্ত এবং অমর যে ফুলপ্যান্ট পরে আছে সেদুটি তাদের বাবার। দুই ভাইয়ের মাপ একই। চার মাস আগে বাবার দুজোড়া জামা-প্যান্ট দর্জিকে দিয়ে ছোট করিয়ে নিয়েছিল। এখনও একটা প্যান্ট রয়েছে। সেটা ছোট করিয়ে অমরকে দেবে। বাবার একজোড়া ধুতি আর একটা পাঞ্জাবি আলমারিতে পড়ে আছে। অনেকদিনই সে

ভেবেছে প্যান্টগুলো অমরকে দিয়ে সে ধুতি পরবে। পাঞ্জাবি তার দরকার নেই। ওটা দিয়ে মায়ের ব্লাউজ হয়ত হতে পারে।

অমরের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওরা কথা বন্ধ করল। দুজন তার মুখ চেনা, অমরের ক্লাসেই পড়ে। তৃতীয়জনকে সে চেনে না। মুখে আলতো হাসি ফুটিয়ে সে একবার শুধু তাকাল মাত্র, যেভাবে বয়স্করা ছোটদের দিকে তাকায়।

যাতে উনুন কামাই না যায় সেজন্য অনন্ত বাজারে যাবার পর শীলা উনুনে আঁচ দেয়। উনুন ধরে উঠতে উঠতে বাজার এসে যায়। দু-বেলার রান্না সে সকালেই সেরে নেয় কয়লা খরচ কমাতে।

অনন্ত যখন ফিরল শীলা তখন হাঁড়িতে ফুটন্ত জলে চাল ঢালছে।

"বাবার একটা ধুতি বার করে দাও ত।"

"কি করবি ?"

শীলা বাষ্প থেকে মুখ সরিয়ে তাকাল।

"পরবি ?"

"হ্যাঁ।"

"তুই বার করে নে না।"

ধুতি-পাঞ্জাবি কাচিয়ে তোলা ছিল। পুরনো হলেও ব্যবহার কম হয়েছে। অনন্ত পাট ভেঙ্গে ধুতিদুটো তক্তাপোশের উপর ছড়িয়ে দিল। দু-তিন জায়গায় ফুটো বোধহয় পোকায় কেটেছে।

অমর ঘরে ঢুকল। ধুতির দিকে একবার তাকিয়ে সে পিছন ফিরে তাক-এ বইখাতা গোছাতে লাগল। অনন্তের মনে হল সকলেরই জামা ফ্রক প্যান্ট থানকাপড় দরকার আর সে কিনা আস্ত দুটো ধুতি পেয়ে যাবে !

"দুটো রয়েছে, তুই একটা নিবি নাকি ?"

"নাহ্, ধুতি আমার চলবে না তাছাড়া কেমন যেন বুড়োটে দেখায়।

অনন্ত অপ্রতিভ বোধ করল। তাকে কি সত্যিই বুড়ো দেখাবে ? তার বয়সী কেউ ধুতি পরে এমন কাউকে তার মনে পড়ছে না।

"তোর জুতোটা একদম গ্যাছে।"

অমর জবাব দিল না। চেয়ারে বসে সে একটা বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়ল।

"জুতো কেনার মত টাকা ত হাতে নেই, আমি যা পাই তাতে একমাসের চালও কেনা যাবে না।"

অমর বই থেকে চোখ সরাল না। অনু ঘরে ঢুকল।

"দাদা, আমার পেন্সিলটা নিয়েছিস ?"

"হ্যাঁ, এই নে।"

অনু বেরিয়ে গেল। ওর ফ্রকের পিঠের বোতামগুলো নেই, একটিমাত্র সেফটিপিন দিয়ে আটকান। অনন্ত পাট মিলিয়ে ধুতিদুটো ভাঁজ করতে লাগল।

ভাত খাবার সময় শীলা বলল, "চুড়িটা বিক্রি না করলে ত আর চালান যাচ্ছে না, কয়লাওলা এসেছিল, দুমাস ওকে কিছু দেওয়া হয়নি, বলে গেল আর কয়লা দেবে না।"

"কত পাবে ?"

"সাড়ে আট টাকা।"

"তোমার কাছে যা আছে তাই থেকে দিয়ে দাও।"

"বাকি দিনগুলো যে কি করে..."

মালকোঁচা দিয়ে ধুতি তার উপর নীল শার্ট। অনন্ত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করল তাকে বুড়োটে দেখায় কিনা। শীলার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "কেমন যেন দেখাচ্ছে !"

"কেন ঠিকই ত আছে।"

"জামাটা ময়লা, ধুতির সঙ্গে মিলছে না।"

"রাতে সাবান দিয়ে কেচে দোব।"

"ওদের জন্য এবার কিছু কিছু কেনা দরকার...চুড়িটা থেকে কত পাবে ?"

"আটগাছা চুড়ি, হার, তোর বাবার আংটি, বোতাম নিয়ে চারভরি সোনা বিয়েতে দিয়েছিল। চুড়িগুলোয় আছে ছ'আনা, করে।"

"এতে কতদিন আর চলবে, অমর রোজগেরে হতে হতে এখনও পাঁচ-ছ বছর ত লাগবেই।"

"ভগবান ঠিক চালিয়ে দেবেন।"

বেরবার সময় শীলা তাকে চার আনা আর কাগজে মোড়া চারখানা আটার রুটি দিল। ট্রামে-বাসে না চড়ে অনন্ত প্রায় একমাইল পথ হেঁটেই যাতায়াত করে। গলি দিয়ে যাবার সময় তার মনে হল সবাই যেন তার দিকে তাকাচ্ছে। পাড়ার কোন লোকের সঙ্গে তার কথাবার্তা বলার মতো আলাপ নেই। সমবয়সীদের সঙ্গেও দরকার না হলে সে কখন কথা বলে না। সবাই জানে সে কুনো, মুখচোরা, অমরের ঠিক উল্টোটি।

দূর থেকে অনন্ত দেখল গৌরী সুলভ পুস্তক ভাণ্ডারের কাউন্টারে দু'গ্লাস চা রেখে ফিরে যাচ্ছে। তার বুকের মধ্যে হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল। চায়ের দোকানের বেঞ্চে সেই ছোকরাটাও বসে রয়েছে যাকে সে সকাল-সন্ধ্যা যাতায়াতের সময় প্রায়ই দেখে। বছর পঁচিশ বয়স হবে। ডিগডিগে, লম্বা, ফর্সা চেহারা। চোখা নাক। চুলে তেল নেই, সামনের দিকটায় ঢেউতোলা। ঘাড় কামান। টেরিলিনের কালো প্যান্ট, ছুঁচলো জুতোটায় পিতলের বকলেস। গায়ে লাল গোলগলা ঝকমকে গেঞ্জি। কোনদিন পরে সাদা ফুলশার্ট। একদিন তার কানে এসেছিল ছোকরাটি গৌরীর বাবাকে বলছে, "কাকাবাবু, একদিন খিদিরপুরে আমার সঙ্গে চলুন, মাল দেখুন..."

ছোকরা এখানে কেন বসে থাকে ? গৌরীর জন্য ? অনন্ত একটু দমে গেল। ছোকরার জামাপ্যান্ট জুতো ঝকঝকে দামী, পরিপাটি, দেখতেও ভাল, কথা বলে ঝরঝরে। অনন্ত নিজের সঙ্গে তুলনা করার কোন চেষ্টাই করল না। চায়ের দোকানের

পাশ দিয়ে যাবার সময় সে আড়চোখে দেখল ছোকরার দিকে তাকিয়ে গলার সবুজ পাথরের মালাটা বুড়ো আঙুল দিয়ে টেনে ধরে গৌরী হাসছে... "বাবা বাজার থেকে কিন্তু এখুনি এসে যাবে, খুলে রাখি ?"

অনন্ত সামনের দিকে তাকিয়ে হেঁটে গেল। চাওয়ালার মেয়েকে নিয়ে আর সে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু মনের মধ্যে একটা জ্বালা সে অনুভব করছে। কিছু একটা যেন সে চেয়েছিল অথচ সেটা তাকে দেওয়া হল না। কারুর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার মত দাবি বা অধিকার তার কোথাও নেই। গৌরী সম্ভবত ভাল করে কখন তাকে লক্ষ্যও করেনি। তার ভাল লেগেছে মানেই যে গৌরীরও ভাল লাগবে এমন কোন কথা নেই।

দুপুরে আলুর দম নিয়ে সে মাথা নিচু করে রুটি দিয়ে খাচ্ছিল। বেঞ্চে তার পাশে মেটর গ্যারাজের দুজন। তারা পাঁউরুটি কিনে এনেছে। এখন রাস্তায় লোক চলাচল কম। লোকদুটো কথা না বলে খেয়ে যাচ্ছে। বাঁশ দিয়ে খাড়া-করা ত্রিপলের ছায়ায় একটা টুলে গৌরী বসে। খেতে খেতে অনন্ত একবার মুখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হল। হাতায় আলুরদমের ঝোল নিয়ে গৌরী উঠে এসে তার প্লেটে ঢেলে দিল।

"না না, আর দরকার নেই।"

"দুটো রুটি খেতে খেতেই ত ঝোল ফুরিয়ে গেল, বাকি রুটিগুলো কি শুকনো চিবোবে ?"

অনন্ত হাসবার চেষ্টা করল। ওর গলায় সবুজ মালাটা নেই দেখে তার ভালো লাগল। মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্বস্তি পাচ্ছে।

"ওব্যেস নেই দুপুরে রুটি খাওয়ার।"

"তাহলে ভাত নিয়ে আস না কেন ? অনেকেই ত আনে টিফিন কেরিয়ারে।"

"ভাত আমি খেয়েই আসি।" অনন্ত কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার বলল, "আমাদের টিফিন কেরিয়ার নেই।"

"দশরথের ভাতের হোটেলে ত খেতে পার।"

অনন্ত চুপ করে খেয়ে যেতে লাগল। হোটেলে ভাত খাবার পয়সা নেই বলতে তার কুণ্ঠা হল। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য সে বলল, "তোমার বাবা খেতে গেছে ?"

"আমি খেয়ে এলে বাবা খেতে যায়। বাবা ফিরে এলে আমি ঘরে যাব। আজ অবশ্য সিনেমায় যাব।" গৌরী হাসল। অনন্তের মনের মধ্যে গুমোট জমে ভারী হয়ে উঠল। নিশ্চয় সেই ছোকরাটার সঙ্গেই যাবে। ওর বাবার কি এতে সায় আছে ? থাকতে পারে। হয়ত ওর সঙ্গে গৌরীর বিয়েও দেবে।

"একা যাবে ?"

কথাটা বলেই অনন্ত লজ্জা পেল। সামান্য এইটুকু আলাপে এমন প্রশ্ন করা উচিত হয়নি। মুখ থেকে হঠাৎ-ই বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু গৌরী এমন গায়েপড়া কৌতূহলে যেন খুশিই হলো।

"একা একা সিনেমা দেখতে আমার ভাল লাগে না।"

"আমারও। অবশ্য সিনেমা আমি খুব কমই দেখি, যুদ্ধের বই দেখতেই ভাল লাগে।"

লোকদুটো দাম চুকিয়ে চলে গেল। দর্জির দোকান থেকে হাঁক শোনা গেল, "একটা চা দিয়ে যাস গৌরী।"

"আমার ভাল লাগে রগড়ের বই দেখতে।"

"চার্লি চ্যাপলুনের বই দেখেছ ? আমাদের স্কুল থেকে একবার দেখাতে নিয়ে গেছল, দারুণ হাসির।"

"স্কুলে পড়তে ?" গ্লাসে লিকার ঢালতে ঢালতে গৌরী বলল।

"হ্যাঁ।"

"পড়া ছাড়লে কেন ?"

"সংসার চালাতে হবে ত। বাবা হঠাৎ বাসচাপা পড়ে মারা গিয়ে···দুটো বোন একটা ভাই আর মা রয়েছে।"

গৌরী চামচ নাড়া বন্ধ রেখে ওর দিকে তাকাল। ও-চোখে সহানুভূতি, দরদ। অনন্তের গুমোট কেটে যাচ্ছে।

"তুমিই বড় ?"

"হ্যাঁ। বড় ছেলেরাই ত বাবার জায়গা নেয়।"

ভারী গলায় কথাটিকে কেটে কেটে বলল। বলার সময় গৌরীর মুখের ভাব লক্ষ্য করছিল। কিছু বুঝতে পারল না।

দর্জির দোকানে চা দিয়ে ফিরে এসে গৌরী বলল, "বাবা টাকাকড়ি রেখে যায়নি ?"

"কিচ্ছু না শুধু তের হাজার টাকা পেয়েছি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে, বোনেদের জন্য তোলা আছে, আর মায়ের ভরিচারেক গয়না।"

গৌরীর বাবাকে আসতে দেখে অনন্ত বেঞ্চ থেকে উঠল। পয়সা দেবার জন্য শার্টের পকেটে হাত ঢোকাতেই গৌরী চাপাস্বরে দ্রুত বলল, "দিতে হবে না।"

অনন্ত কয়েক সেকেণ্ড বিভ্রান্তের মত তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে কমলা বাইগার্সের দিকে এগোল। বলতে গেলে গৌরীর সঙ্গে এই তার প্রথম পরিচয় অথচ এত কথা সে যে বলতে পারল, এটাই তাকে অবাক করছে। মেয়েটার চাহনিতে কি যেন একটা আছে যা তাকে সাহসী করে দিল। কিন্তু তাই বলে বিনি পয়সায় আর সে খাবে না, একবারই যথেষ্ট বরং কিছু একটা উপহার দিয়ে সে শোধ দেবে।

সন্ধ্যায় অনন্ত বাড়ি ফেরার সময় হাতিবাগানে একটা রেস্টুরেন্টে গৌরী আর সেই ছোকরাকে দেখতে পেল। টেবুলে পাশাপাশি ওরা। ছোকরা প্লেটের দিকে মুখ নামিয়ে কাঁটা চামচে মাংসখণ্ড গাঁথায় ব্যস্ত। রাস্তার দিকে একবার যেন তাকাল। অনন্তকে বোধহয় দেখতে পায়নি কিন্তু সে ওর গলায় সবুজ মালাটা দেখতে পেয়েছে। গৌরীর পরনে হলুদ রঙের শাড়ি।

ক্লান্ত, মন্থর পায়ে যখন সে বাড়ি পৌঁছোল তখন নিজেকে তার মনে হচ্ছিল বুড়ো হয়ে গেছে।

কে বা কারা যেন বলেছিল, 'অনন্ত খুব ভালো ছেলে।' তখন তার বয়স কত ছিল ? সাত, আট, হয়ত নয়। তখন তার চারপাশের জগৎ ধীরে ধীরে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ; তখন মানুষজন সম্পর্কে সচেতনতা শুরু হচ্ছিল, তাদের সে অলাদা আলাদা করে বুঝে প্রত্যেককে নিজস্ব ছকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিল। এখন থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগের ঘটনা মনে করতে গিয়ে তার মনে হচ্ছে স্মৃতি যেন তার সঙ্গে চালাকি করছে। বহু মানুষ, বহু ঘটনা ধূসর হয়ে গেছে, কিছু কিছু মানুষ চেতনায় রয়েছে আলোকিত কুয়াশার মত।

একা নির্জন অন্ধকার ঘরে অনন্ত তার অতীতের দিকে দৃষ্টি রাখতে গিয়ে মানুষ, ঘটনা, দৃশ্য, শব্দ, রঙ এখন আর আলাদা করতে পারছে না। রেবতীর চলে যাওয়াটা তাকে যতটা নাড়া দিয়েছে একদা গৌরীর জন্য তার হৃদয় কি এইভাবেই মুচড়ে উঠেছিল ? অমর যেদিন বলল, "আমি আর এখানে থাকব না" সেদিনও কি এমন করে অসাড় হয়ে গেছল তার অনুভব ক্ষমতা !

অমরকে সে চড় মেরেছিল। কারণটা আজও তার মনে আছে। স্কুল ফাইনালে প্রথম পঁচিশজনের মধ্যে অমর স্থান পেয়েছিল। অবিনাশকাকা এক বাক্স সন্দেশ কিনে এনেছিল। শীলা উপরে জেঠিমাদের কয়েকটা দিয়ে আসে, সামনে উৎপলদের বাড়িতেও অনন্ত নিজে গিয়ে পাঁচটা সন্দেশ দেয়। উৎপলের দাদু অবাক হয়ে বলেছিল, "তিনটে লেটার পেয়েছে, বলিস কি !"

তার এক সপ্তাহ পরেই দাদু মারা যায়। হাই ব্লাডপ্রেসার ছিল, হৃৎপিণ্ডও বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছল। বিকেলে বারান্দায় চেয়ারেই ঢলে পড়ে। দামী খাটে, প্রচুর ফুলে সাজিয়ে, সংকীর্তন করে ওকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। অমরও সঙ্গে গেছল। শ্রাদ্ধে অনন্তদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে গেছল উৎপল। পরিবেশনকারীদের অন্যতম ছিল অমর। প্রায় আটশ লোক নিমন্ত্রিত হয়েছিল। কাপড় দিয়ে রাস্তার অর্ধেকটা ঘিরে টেবলে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেদিন অনু মায়ের পুরনো সিল্কের শাড়ি পরেছিল। অলু উপর থেকে ইস্ত্রি এনে বাড়িতে কাচা ফ্রকটাকে মোটামুটি কাজের বাড়িতে যাওয়ার যোগ্য করে তুলেছিল। অনন্ত নিজেদের সদরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, খাওয়া শেষ করে একদল বেরিয়ে এলে নতুন পাত পড়ামাত্র গিয়ে বসে পড়বে। তখন অমর তার পাশ দিয়েই বাড়িতে ঢোকে। সে জিজ্ঞাসা করেছিল, "কিরে, চলে এলি যে ?" অমর অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলেছিল।

নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফিরে সে মায়ের কাছে কিভাবে তার সামনের লোকটি বাজি ধরে চল্লিশটা রসগোল্লা টপাটপ খেয়ে গেল সেই গল্প করছিল, "ভাবতে পারবে না, লোকটা এই টিঙটিঙে। বাজি ছিল তিরিশটা, দশটা বেশি খেল !"

অনু বলল, "কি বাজি ছিল ?"

"এক টাকা !"

"মা-ত্ত-র !"

তখন মা হঠাৎ বলে ফেলে, "অমর অনেকগুলো সন্দেশ এনেছে।"

সে প্রথমে বুঝতে পারেনি। তারপরই খটকা লাগতে জিজ্ঞাসা করে, "কিভাবে আনল ? ওরা কি অমরকে দিয়েছে ?"

"দেবে কেন। এমনিই এনেছে।"

"এমনি, এমনি মানে ? নিশ্চয় লুকিয়ে এনেছে···চুরি করে এনেছে।"

মা-কে চুপ করে থাকতে দেখে অনন্ত রাগে দাউদাউ করে উঠেছিল।

"চোর ! আমার ভাই চোর ! সামান্য কটা সন্দেশের লোভ আর সামলাতে পারল না ?"

সে লাফিয়ে উঠেছিল। ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে বাসন ছুঁড়ে ছুঁড়ে খুঁজেছিল।

"নিশ্চয় কেউ না কেউ ওকে সন্দেশ সরাতে দেখেছে।···আমাদের সবাইকে চোর ভাবছে··· চোরের ফ্যামিলি···"

"তুই অমন কচ্ছিস কেন··· পাগল হলি নাকি ?"

শোবার ঘরের তাকে কাগজে মুড়ে রাখা ছিল প্রায় গোটা কুড়ি সন্দেশ। চাপ খেয়ে দলা পাকান। মা সেটা অনন্তের হাতে তুলে দিতেই সে ছুটে বেরিয়ে যায় উৎপলদের বাড়িতে।

"কাকাবাবু এগুলো নিন, অমর বাড়িতে নিয়ে গেছল।"

উৎপলের বাবা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

"কি ব্যাপার ?"

"অমর এগুলো বাড়িতে নিয়ে গেছল।"

'চুরি' শব্দটা বলতে গিয়েও বেধে গেল গলায়। কাঁধে হাত রেখে উৎপলের বাবা মৃদুহেসে বলেছিল, "আরে দূর, ছেলেপুলেরা এরকম একটু-আধটু করে থাকেই ফেরত দেবার কি দরকার। ও তুমি নিয়ে যাও।"

"না, আমরা নিতে পারব না।"

টেবলে তখন কাগজ বিছানো হচ্ছে, অমর কলাপাতা হাতে অপেক্ষা করছিল। অনন্ত ছুটে গিয়ে সন্দেশমোড়া কাগজটা টেবলে রাখল। দলাপাকান কাগজটার ফাঁক থেকে সন্দেশ দেখা যাচ্ছে। সেইদিকে তাকিয়েই অমরের মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। সে ফ্যালফ্যাল করে তার আশেপাশের কৌতূহলী মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে হাতের কলাপাতাগুলো টেবলে নামিয়ে দিল।

"ছেলেটা সত্যিই ভালো।"

কে যেন তখন বলেছিল। অনন্ত কোনদিকে আর তাকায়নি। বাড়িতে এসে গুম হয়ে দালানে বসে থাকে। একটু পরেই অমর আসে।

"ভালো ছেলের সার্টিফিকেট নেবার জন্য আমাকে এভাবে ডোবালে কেন ? আমি পাড়ায় মুখ দেখাব কি করে ?"

অনন্ত উঠে দাঁড়াল। কয়েক সেকেণ্ড পর বিরাজমান নৈঃশব্দের মধ্যে চড়ের শব্দটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। অমর কোন কথা না বলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। একটু পরে অনন্ত ওর পাশে গিয়ে শোয়।

অমর দু-দিন ঘর থেকে বেরয়নি। তৃতীয় দিন দুপুরে কোথায় যেন যায়, ফিরে আসে অনেক রাতে যখন পাড়া নিশুতি হয়ে গেছে। মা শুধু বলেছিল, "ভাত তোলা আছে খাবি ?"

ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গতেই অনন্ত শুনতে পায় দালানে কথা বলছে মা আর অমর।

"আমি এখানে আর থাকব না, চলে যাচ্ছি।"

"কোথায় যাবি ?"

"ব্যবস্থা করে এসেছি।"

"ব্যবস্থা ?"

"এণ্টালিতে একজনের বাড়িতে থাকব, তার দুটো বাচ্ছা ছেলেকে পড়ান, দেখাশোনার কাজ করতে হবে।"

"তোর নিজের পড়াশুনো ?"

"করব।"

অনন্ত শুনতে শুনতে অসাড় হয়ে গেল। তার মনে হল অমর আর কোনদিনই এই সংসারে ফিরে আসবে না, চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কেন ? বরাবরই ও আলগাভাবে ছিল এই সংসারের সঙ্গে। কিছুটা স্বার্থপর, কিছুটা উদাসীন। সবাই বলে ট্যালেন্টেড। ওকে বই নিয়ে পড়তে বিশেষ কেউ দেখেনি, অথচ ভাল রেজাল্ট করেছে। অনন্তের আশা ছিল, অমর ভাল চাকরি করে স্বচ্ছলতা আনবে, অন্তত বাবার থেকে বেশি রোজগার করবে।

সন্দেশগুলো ফিরিয়ে না দিলে অমর থেকেই যেত। সে কি অন্যায় কাজ করেছে ? অন্তত দু'দিন ধরে উত্তর খুঁজেছে। অমরের ধারণা ভালো ছেলে সাজার জন্য সে কাজটা করেছে। ভগবান জানে,মোটেই তা নয়। এই রকম কিছু দেখলে তার ভিতরে অসহ্য একটা চাপ তৈরি হয়, অস্থিরতা জাগে। সেটা বার করে না দিলে তার মনে হয় দম ফেটে মরে যাবে।

তার তখন দশ-এগার বছর বয়স। পাড়ার সর্বজনীন দুর্গা পুজোয় তারা কয়েকজন সমবয়সী ভলাণ্টিয়ার হয়েছিল। প্যাণ্ডেলের একধারে সাবিত্রী-সত্যবানের মূর্তি রাখা ছিল। প্রতিমা দেখার পর মেয়েরা সরায় রাখা সিঁদুর সাবিত্রীর মাথায় ছুঁইয়ে নিজেদের সিঁথিতে দিত। সামনে রাখা থালায় পয়সা ফেলত। নানান আকারের রেজগিতে থালাটা ভরে উঠত দু-তিন ঘণ্টাতেই। দশ পয়সা থেকে সিকি-আধুলি, দু-টাকা, এক-টাকার নোটও থালায় পড়ত। যুগলদা থালাটা তুলে নিয়ে নতুন একটা থালা রেখে যেত।

নবমীর দুপুরে অরবিন্দই বলেছিল, "পার্কে নাগরদোলা বসিয়েছে, চাপবি ?"

"পয়সা নেই।"

অরবিন্দের মামাতো ভাই পুজোয় বেড়াতে এসেছিল পাটনা থেকে। নাম ছিল নন্দন। তার কাছে ছিল একটা সিকি।

"দশ পয়সা এক-এক বারে। আরও ত পয়সা চাই।"

অরবিন্দ আর নন্দন নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে অনন্তকে বলল, "তুই এইদিকটা আড়াল করে দাঁড়া।"

"কেন?"

"যা বলছি শোন্।"

তিনদিক ত্রিপল দিয়ে ঢাকা ছোট্ট একটা ঘরে দু-হাত লম্বা সাবিত্রী হাতজোড় করে হাঁটু গেড়ে ভগবানকে ডাকছে, তার পাশে শোয়ান সত্যবান। সামনে বাঁশের বেড়া। দুপুরে ভিড় প্রায় নেই-ই। চৌকিতে রাখা ক্যাশবাক্সে মাথা রেখে অন্যদিকে মুখ করে কোষাধ্যক্ষ যুগলদা আধশোয়া। দুটি ছেলে রেকর্ড বাজাচ্ছে।

"পিছন ফিরে বাঁশে হেলান দিয়ে এদিক মুখ করে দাঁড়া।"

অনন্ত ওর কথা-অনুযায়ী দাঁড়িয়েছিল। নন্দন তার পাশে দাঁড়াল। অরবিন্দ বাঁশের উপর ঝুঁকে খুব মন দিয়ে সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে। ওর হাতে একটা রুমাল। অনন্ত দেখল, রুমালটা হাত থেকে হঠাৎ থালার উপর পড়ল। অরবিন্দ দু-পাশে তাকিয়ে নিচু হয়ে এক লহমায় রুমালটা মুঠো করে তুলে প্যান্টের পকেটে রাখল।

অরবিন্দ মন্থরভাবে প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় কর্পোরেশনের খাবার জলের ট্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তাদের দু-জনকে ডাকল।

"চল্।"

"না, যাব না।"

"নাগরদোলায় চাপবি না?"

"না। আমি দেখেছি অরবিন্দ রুমালের সঙ্গে পয়সাও তুলল।"

"আমরা ওমলেটও খাব। তাড়তাড়ি আয়।"

অনন্ত যায়নি। ওরা দুজন দূর থেকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডেকে তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। সে মাথা নেড়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। তখন তার ভয় করছিল। যদি কেউ দেখে থাকে? সারা পাড়ার লোক জেনে যাবে, রাস্তায় বেরলেই লোকেরা আঙুল দিয়ে দেখাবে, কি রকম চোখে যেন তাকাবে। তার থেকেও বড় কথা বাবা, মা লজ্জায় পড়বে।

প্যাণ্ডেলের সামনের বাড়ির ঝি দোতলার জানালা থেকে দেখেছিল। সে বলে দেয় যুগলদাকে।

"পয়সা সরিয়েছে ওরা?"

"কি জানি, আমি দেখিনি।"

"তুই ত ওদের সঙ্গেই দাঁড়িয়েছিলি।"

"হ্যাঁ, তবে আমি দেখিনি।"

পুজো কমিটির তিন-চারজন তখন হাজির ছিল। তারা নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে আলোচনা করছিল। একবার তার কানে এল—"না না এ-ছেলেটা ভালো ....দলে নেই।"

পরদিন অরবিন্দ আর তার মামাতো ভাইকে ডাকিয়ে এনে প্যাণ্ডেলে কান ধরে ওঠ-বস করান হয়। তার দু'দিন পর ওরা দুজন অনন্তকে সন্ধ্যার সময় ধরেছিল গলির মুখে।

"তুই বলে দিলি কেন?"

"না বলিনি।"

"বলিসনি?"

অরবিন্দ তার পেটে এক ঘুঁষি মারল। সে পেট চেপে ধরে কুঁজো হতেই, ওরা দু-জনে এলোপাতাড়ি ঘুঁষি চালাল তার বুকে- পিঠে-মাথায়। সে দু-হাত তুলে যতটা সম্ভব আটকাতে চেষ্টা করে। একবারও পাল্টা আঘাত করার চেষ্টা করেনি বা পালাতে চায়নি।

"ভালো ছেলে সাজা হচ্ছে? বলিসনি ....তুই বলিসনি?"

"না, আমি বলিনি।"

ওরা আবার ঘুঁষি চালিয়েছিল। সেইসময় পাড়ারই একজন দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ধমক দেয়। ওরা দু-জন সরে যাবার সময় শাসায়, "আচ্ছা, পরে আবার ধরব, যাবি কোথায়?"

অরবিন্দ আর তাকে কিছু বলেনি। তার ঠোঁটের কোণে রক্ত দেখে মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে কারণটা বলেনি।

"হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছি।"

"দেখে চলবি ত?"

অনন্ত তখন হেসেছিল। মানসিক আনন্দের প্রতিচ্ছায়ার মত এমনই অস্পষ্ট যে লক্ষ্যই করা যায় না হাসিটা। সেইদিন থেকে তার হৃদয়ের অন্তস্থলে দ্রুত একটা কি যেন পরিবর্তন ঘটে গেছল। পাড়ার বা স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে সে আর মিশত না। স্কুল থেকে ছেলেরা ছোট ছোট দলে বাড়ি ফিরত। সে ফিরত একা। যা তার চোখে পড়ত, বাসে ঝুলন্ত মানুষ, বৃষ্টি, বারান্দায় ঝোলান খাঁচায় পাখি, নর্দমার নোংরা জল সব দেখত।

'ভালো ছেলে'। সেদিন পুজো প্যাণ্ডেলে কে যেন বলেছিল। কিন্তু সে 'ভালো ছেলে' কেন? অরবিন্দের মত সে পয়সা চুরি করতে পারেনি। সততার জন্য নয়, আসলে, তার ইচ্ছা হয়নি কিংবা সাহসে কুলোয়নি বলেই।

অরবিন্দই স্কুলে তার সম্পর্কে চাউর করে দেয়— ভালো ছেলে। তার মত আরও অনেকে তখন বলতে শুরু করে। সে শুধু হাসত আর সেখান থেকে সরে যেত।

"অনন্ত সাধু হয়ে যাবে। বাজি ধরে বলছি।"

ক্লাসে একদিন ছেলেরা তার পিছনে লেগেছিল। সে মুখে হাসি ফুটিয়ে শুধু শুনে গেছল। হয়ত তার হাসিটা খাঁটি ছিল না কিন্তু শান্ত নিরাসক্ত একটা ভাব তাতে ছিল।

"ওকে চড় মেরে দ্যাখ, কিছছু বলবে না।"

একজন তার গালে আলতো করে চড় মারে। সে তখনও হাসছিল।

অমরও তাকে 'ভালো ছেলে' বলল, কিন্তু সত্যিই কি সে তাই ? সে ভীতু আর মুখচোরা বলেই কি সবার আগে নিরাপদ হবার জন্য ভাল ছেলে সাজে ?

ঘর থেকে বেরিয়ে সে দেখল মা দেয়ালে ঠেস দিয়ে একদৃষ্টে উঠানের দিকে তাকিয়ে।

অনন্ত অপরাধীর মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কলতলায় গেল মুখ ধুতে। ফিরে এসে দেখল মা একইভাবে বসে।

"আমি কি অন্যায় করেছি ?"

মা একবার মুখ তুলে তাকাল। অনন্তের মনে হল সেই চাহনিতে যেন বলা রয়েছে— ন্যায়-অন্যায় বিচার করে কি লাভ ?

"ও চলেই যেত, আজ নয়ত কাল।"

কয়েক ঘন্টা পর অনন্ত চায়ের দোকানটার সামনে দিয়ে যাবার সময় দেখল সেই ছোকরা, পরে জেনেছে ওর নাম রমেন, বেঞ্চে বসে সিগারেট খাচ্ছে, হাতে চায়ের গ্লাস, ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তমুখে লোক-চলাচল দেখছে। দোকানে গৌরী নেই। এই নিয়ে গত এগার দিন গৌরী অনুপস্থিত।

দুপুরে একটা ছোটছেলেকে সে দোকানে দেখল। মুখের আদল আর গায়ের রঙ থেকে তার মনে হল বোধহয় গৌরীর ভাই। তবু নিশ্চিত হবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাকে আগে দেখিনি ত, তোমাদের দোকান ?"

"হ্যাঁ।"

"গৌরী কে হয় ?"

"দিদি।"

"ও আজ এল না যে ?"

"দিদির বিয়ে।"

অনন্ত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করল, "কবে ?"

অপরিচিতের সঙ্গে ছেলেটি যেন এই বিষয়ে কথা বলায় অনিচ্ছুক। অনন্ত আর কৌতূহল দেখাল না। তার মনে হল, রমেনের সঙ্গে নয়, অন্য কোথাও গৌরীর বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। তা যদি হয় তাহলে ভালই। রমেনকে তার ধাপ্পাবাজ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। তবে সে বিষণ্ণবোধ করল, গৌরীকে আর দেখতে পাবে না। এইরকম বিষণ্ণতা অমর সম্পর্কে তার হয়নি। এটি তার একান্ত ব্যক্তিগত অন্যটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বার্থ। অমর রোজগার করে তার বোঝা হালকা করে দেবে এছাড়া আর কোন প্রত্যাশা ওর কাছে নেই।

দু-দিন পর বৃষ্টি হচ্ছিল সন্ধ্যাবেলায়। অনন্ত আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটা গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়েছিল ভিড়ের একধারে। রাস্তার কিনারে জল জমে গেছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জলে ফুটপাথ, রাস্তা এবার ডুবে যাবে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে বৃষ্টির ছাঁট আসছে আর মানুষগুলো পিছিয়ে এসে জমাট হচ্ছে। রাস্তায় আলো কম, গাড়িও কম, লোকজন নেই বললেই চলে। স্টপে বাস এসে দাঁড়ালে এখান ওখান থেকে ছুটে এসে লোক উঠছে।

সেই সময় গৌরীকে ছুটে গাড়ি বারান্দার নিচে আসতে দেখে তার বুকটা ধক্ করে উঠল। বোধহয় বাস থেকে নামল। অনন্তকে দেখতে পায়নি। ওর কপাল, গাল, বাহু, থুতনি বেয়ে জল ঝরছে। আঙুল দিয়ে টেনে টেনে কপাল থেকে জল মুছে গৌরী পিছনে তাকাল।

"আরে !"

অনন্ত হাসল। সামান্য ইতস্তত করে গৌরীর পাশে এল। চোখে পড়ল গলার সবুজ মালাটা। গলা থেকে কোমর পর্যন্ত ফ্রকটা লেপটে রয়েছে। স্তনের ডৌল এমনকি বোঁটাও ব্রেসিয়ারের মধ্য দিয়ে এত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে অনন্তের মনে হল ওর সর্বাঙ্গে যেন কোন আবরণ নেই।

অনুও বড় হয়ে উঠেছে। তের বছরের হল। গৌরীর মত এমন ভাপিয়ে ওঠা শরীর নয় তবু ওর বুক চোখে পড়ে। কয়েকদিন আগে সে ঘরের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়েছিল। অনুর পরনে তখন শুধুমাত্র সায়া, একটা হাত সবে ব্লাউজের মধ্যে গলিয়েছে। তাকে দেখেই কুঁকড়ে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে যায়। ছি ছি কি ভাবল। অপ্রতিভ হয়ে সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দরজায় এসে মা'র সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে।

"এখানকার কাজটা ছেড়ে দেব ভাবছি।"

"কেন !"

"দূর, এসব কাজ শিখে কি উন্নতি করা যায় ! পঁচিশ-তিরিশ বছর কাজ করছে এক একজন আর মাইনে কিনা দু'শ-আড়াই'শ।"

"তাহলে কি করবি ?" ভয়ে ভয়ে মা বলেছিল। "তবু কয়েকটা টাকা ত আসছে।"

"চল্লিশ আবার টাকা নাকি ? গয়নাগুলোর কিছুই ত আর রইল না, এরপর ...."

"পোস্টাপিসের কাগজ না ভাঙালে আর ত কোন উপায় নেই। দাসেদের বাড়িতে কাজটা নিলে তবু ...এখন আর অত মানসম্মান দিয়ে কি লাভ ? ভগবান যখন যে-অবস্থা দেবেন সেইভাবেই তখন চলতে হবে।"

"টাকাটা অনু-অলুর বিয়ের জন্য।"

"বারবার তুই ওই বলিস। খেতে-পরতে পাচ্ছি না আর বিয়ের জন্য টাকা রেখে দেওয়া ! রাখ ত ওসব কথা। যেমন ভাগ্য করে এসেছে তেমনি বিয়ে হবে। কবে তুই আয় করবি, অমর করবে, তার জন্য অপেক্ষা করে কি সংসার চলবে ? অনুকে স্কুল ছাড়িয়ে দেব, মিছিমিছি টাকা নষ্ট করা। ও নিজেও আর পড়তে চাইছে না।"

"সেকি, ছেড়ে দেবে পড়া ?"

অনন্ত মর্মাহত হয়েছিল। অনু তখন শাড়ি পরে এসে দাঁড়িয়েছে।

"আর পড়বি না ?"

"না।"

অনুর স্বরে জেদ ছিল। সংসারকে সাহায্য করতে চায়। কিন্তু ক'টা টাকাই বা তাতে বাঁচবে ? ভাল ঘর-বর পাবার কোন যোগ্যতাই ওর নেই। সাদামাটা, স্বাস্থ্য নেই, চটক নেই, লেখাপড়াও ক্লাস সিক্স। শুধু অনু নয়, অলুরও বিয়ে দিতে হবে কিন্তু কিভাবে যে পারবে তা সে জানে না। অমর নাকি দুটো টিউশনি করছে। ষাট-সত্তর টাকা নিশ্চয় হয়। কাউকে কিছু বলেনি, কিছু চায়ও না। কলেজের মাইনে, বইপত্র, বা জামাপ্যান্ট কেনার জন্য হাত পাতে না। কিন্তু তাতেও কি কোন সাশ্রয় হচ্ছে। শুধু আধ-পেটা খেয়ে থাকতেই ত কম করে মাসে দেড়শ-দু'শ টাকা দরকার। সার্টিফিকেটগুলো না ভাঙ্গালে উপোস দিয়ে মরতে হবে।

দমকা বাতাস গাড়ি বারান্দার নিচে দাঁড়ানো লোকগুলোকে বৃষ্টির ছাঁট ভিজিয়ে দিল। গৌরী সরে এল তার গা ঘেঁষে।

"তুমি এখানে কোথা থেকে ?"

"একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম, পেলুম না।"

"মনে হল তুমি বাস থেকে নামলে।"

"না ত, এতক্ষণ ওধারে মুদি দোকানের সামনে একটা ছোট্ট বারান্দার নিচে দাঁড়িয়েছিলুম। দেখেছ কিরকম ভিজে ঢোল হয়ে গেছি !"

"জ্বর হতে পারে।"

"আমার অভ্যেস আছে ভেজার।"

অনন্ত আড়চোখে দেখল কয়েকজনের নজর গৌরীর বুকের উপর গেঁথে রয়েছে। সে একটু সরে গৌরীকে আড়াল করল।

"তোমাকে আর দোকানে দেখি না যে ?"

"ভাল লাগে না অই যাই না।"

"তোমার নাকি বিয়ে ?"

"কে বলল ?"

"তোমার ভাই।"

"অ।"

দুজনেই চুপ করে রইল। রাস্তার আলোয় বৃষ্টিকণা বরফের মত ঝলসে উঠছে। অনন্তের গায়ে কাঁটা দিল ঠাণ্ডা বাতাসে। গৌরী লেপটানো ফ্রক দেহ থেকে ছাড়ানোয় ব্যস্ত। রাস্তার মাঝে গোছ ডুবে যাওয়ার মত জল জমে গেছে। গাড়ি চলে যাওয়ামাত্র ঢেউ এসে ফুটপাথের উপর ভাসিয়ে দিচ্ছে। ওরা পিছিয়ে বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

"জোর করে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে।"

"এত তাড়াতাড়ি ?"

"আমিও ত তাই বলেছি। বাবা-ই শুনছে না....বোধহয় আঁচ পেয়েছে।"

"কিসের ?"

"রমেনদার সঙ্গে আমার ব্যাপারটার।"

"কি ব্যাপার ?"

"থাক্, আর ন্যাকামোয় দরকার নেই। ব্যাপার কাকে বলে যেন উনি জানেন না !"

অনন্ত কথা বলল না। গৌরীর ভিজে চুল থেকে সে নারকেল তেলের গন্ধ পাচ্ছে। তার কনুইয়ের সঙ্গে দু'বার ছোঁয়া লাগল গৌরীর বাহুর। মা বা বোনেদের ছাড়া আজ পর্যন্ত কোন মেয়ের এত কাছে সে দাঁড়ায়নি। অদ্ভুত ধরনের একটা প্রফুল্লতা আর সাহস তার ভিতরে তৈরি হয়ে যাচ্ছে অথচ সে জানে গৌরীর মনে তার জন্য আলাদা কোন জায়গা নেই। নেহাতই রোজ দেখা হতে হতে যতটুকু আলাপ। তাদের বয়সটা কাছাকাছি। গৌরী স্বভাবে খোলামেলা, কথা বলতে ভালবাসে। বোধহয় লেখাপড়া একদমই করেনি।

বৃষ্টি ধরে আসছে। অনেকেই হাত বাড়িয়ে দেখে নিচ্ছে কতটা কমেছে। কয়েকজন গাড়িবারান্দা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। জায়গাটা ফাঁকা হয়ে আসছে দেখে অনন্ত অস্বস্তিবোধ করে বলল, "তুমি ত এবার বাড়ি যাবে ?"

"হ্যাঁ যাব, তুমিও ত যাবে।"

"আমার খুব একটা তাড়া নেই। আমি এ-রাস্তা ও-রাস্তা করে বাড়ি যাই।"

"বাড়িতে কে কে আছে ?"

"মা আর দুই বোন। একটা ভাই ছিল সে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তোমায় ত বলেইছি আমার বাবা নেই....বাসচাপা পড়ে মারা গেছে।"

"আহ্।"

অনন্তের মনে হল গৌরীর মুখ থেকে শব্দটা স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে এসেছে।

"চল এবার হাঁটি, তুমি ত এখন সোজা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দিকে যাবে, আমি যাব একেবারে উল্টোদিকে, বিবেকানন্দ রোড হয়ে, হেদোর পাশ দিয়ে।"

"আগে একটু গরম চা খেয়ে নিলে বেশ হত, খাবে ?"

"আমি দিনে দু-কাপের বেশি খাই না।"

"আমার জন্য নয় আজ এক কাপ বেশিই খাবে। চল, একটু এগোলেই ঘোষ কেবিন।"

"তুমি দেখছি এখানকার সব চেন, আস বুঝি ?"

গৌরী হাসল। ওরা ফুটপাথ দিয়ে জল ভেঙ্গে চলতে শুরু করল। দুজনেই হাতে চটি তুলে নিয়েছে। বৃষ্টি এখন গুঁড়িগুঁড়ি। ফুটপাথ কোথায় শেষ হয়ে রাস্তা শুরু হয়েছে সেটা জলে ডুবে থাকায় বোঝা যাচ্ছে না।

"দাঁড়াও আমি আগে রাস্তায় নামি।"

অনন্ত পা টিপে টিপে ফুটপাথের কিনারে এসে সন্তর্পণে রাস্তায় নেমে হাত বাড়িয়ে দিল : "হাতটা ধরে নাম।"

গৌরী তার হাত ধরে নামার সময় গর্তে পা ছিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। সে দু-হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েই হাত সরিয়ে নিতে গেল। গৌরী আঁকড়ে ধরে রেখেছে তার হাত।

"ধরে থাক, আবার কোন গর্তে যে পড়ব কে জানে।"

অনন্তের মনে হচ্ছে হাতটা তার দেহের অংশ নয়। বুকের মধ্যের ধকধকানিটা এবার কানে তালা লাগিয়ে দেবে। লোমকূপগুলো এক একটা আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠেছে। এই প্রথম নারীদেহের কোমলতা সে অনুভব করল। নিজের অজান্তে সে গৌরীর কব্জি অস্বাভাবিক জোরে চেপে ধরতেই মুখ তুলে গৌরী তাকাল, চোখে বিস্ময়। অনন্তের চোখ জ্বালা করছে, সে পরিচ্ছন্নভাবে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

"হাতটা ছাড়।"

সে দ্রুত হাতটা টেনে নিয়ে নিজের দেহের সঙ্গে চেপে ধরল।

"আমি চা খাব না, আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।"

"আমার কাছে আছে।"

ঘোষ কেবিনে পাশাপাশি ওরা বসল। দুজনেই ভিজে সপসপে। গৌরী ইশারায় দোকানের ছেলেটাকে ডাকল।

"দুটো ডবল হাপ।"

"আর কিছু দোব, ওমলেট, মটন চপ, মটন কাটলেট, মটন দোপেঁয়াজি, ফিশ ফ্রাই?"

গৌরী তাকাল অনন্তের দিকে। সে মাথা নাড়ল।

"দুটো ফিশ ফ্রাই।"

ছেলেটি সরে যেতেই ফিসফিস করে অনন্ত বলল, "আমার কাছে সত্যিই পয়সা নেই।"

"বললুম ত আমার কাছে আছে।"

"তুমি পেলে কোথায়?"

"যেখান থেকেই পাই না।"

"কেউ দিয়েছে তোমায়?"

গৌরী চুপ করে রইল।

"তোমার রমেনদা?"

এক চিলতে হাসি ওর মুখে ফুটে উঠল। শাদা পাথরের টেবলে আঙুলের টোকা দিতে দিতে মুখটা ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল।

"মালাটাও ওর দেওয়া।"

"দেখতে ভাল নয়?"

"বাবা ত বিয়ে ঠিক করেছে, তাহলে কি করবে?"

"করুক না ঠিক, আমি আমার ব্যবস্থা করব।"

"কি ব্যবস্থা?"

"সে এখন বলব না।"

"তোমার রমেন এখানেই কোথায় যেন থাকে।"

"হ্যাঁ আর একটু এগিয়ে বাঁ দিকের গলিটায়। ওদের বাসাতেই এসেছিলুম, বেরিয়ে গেছে কোথায়।"

"তুমি প্রায়ই আস?"

"হ্যাঁ।"

"লোক কেমন, কি করে?"

"ফরেন মাল খিদিরপুর থেকে এনে বিক্রি করে, আমাকে একটা আমেরিকান জর্জেট দিয়েছে, দারুণ শাড়িটা।"

"তুমি আমার কাছে একটা আলুর দমের দাম নাওনি, মনে আছে? আবার আজকেও খাওয়াচ্ছ। তোমার কাছে আমার দেনা রয়ে গেল।"

"শোধ দেবে বুঝি!"

"হ্যাঁ, তবে এখন নয়। আগে হাতে টাকা আসুক।"

"এরা কত দেয়?"

"চল্লিশ টাকা।"

"য়্যা, মোটে চল্লিশ।"

গৌরীর মুখে অবিশ্বাসের ছাপ দেখে অনন্ত লজ্জা পেল। মুখ নিচু করে আঙুল দিয়ে টেবলে আঁকিবুকি কাটতে লাগল। ছেলেটা টেবলে প্লেট নামিয়ে রাখতেই সে মুখ তুলল। আড়ষ্টহাতে ছুরি দিয়ে ফ্রাইটা খণ্ড করতে করতে বলল, "যা জুটে গেল তাই করছি, চাকরির যা বাজার। শুধু শুধু বসে থাকার চাইতে তবু ত...তবে চেষ্টা করে দেখছি।"

ফ্রাইয়ের একটা খণ্ড মুখে দিয়ে আরামে সে চিবোতে লাগল। স্বাদটা বড় ভাল, খিদেও পেয়েছে খুব। গৌরীর ছুরি-কাঁটা ধরা দেখে সে বুঝতে পারছে তার মত আনাড়ি নয়। হঠাৎ তার মনে পড়ল অনু-অলুকে। সে আজ বাজার থেকে যা এনেছে তাই রান্না হয়েছে। সকাল থেকে ভাত আর আলু-ঝিঙে-পোস্ত ছাড়া এখনও পর্যন্ত কিছু ওদের পেটে পড়েনি। মা পেট ভরে কখনই খেতে পায় না। ছেলেমেয়েদের খাইয়ে কিছুই ত প্রায় থাকে না।

ফ্রাইটা আর তত স্বাদু মনে হচ্ছে না। পর পর মুখগুলো ভেসে উঠছে। ওরা যখন জানবে সে রেস্টুরেণ্টে খেয়ে এসেছে তখন মনে মনে কিছু একটা নিশ্চয় ভাববে। যদি ভাবে সংসারের টাকা থেকে সরিয়ে সে খেয়েছে! গৌরী নামে একটা মেয়ে যে তাকে খাইয়েছে, একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

তার বুকের মধ্যে একটা মোচড় দিয়ে উঠল। একটু আগেও তার মনে হচ্ছিল আজকের দিনটা জীবনে মনে রাখার মত একটা দিন। যতদিন বাঁচবে সে গৌরীর প্রত্যেকটি কথা, দেহের যাবতীয় নড়াচড়া, ওর চুলের গন্ধ, ওর চাহনি, হাসি, বিস্ময় সব স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রেখে দেবে। তাই সে উদগ্রভাবে প্রতিটি মুহূর্তকে শুষে নিয়ে জমা করে রাখছিল তার চেতনার প্রতিটি কোষে। কিন্তু হঠাৎ কোষগুলোকে ফাটিয়ে দিল কতকগুলো শুকনো অবসন্ন মুখ।

"আচ্ছা, এই যে খাচ্ছি। মুখে গন্ধ হবে ?"

"হবেই ত। পেঁয়াজ, রাই সর্ষে···গন্ধ হবে না ?"

অনন্ত দমে গেল। সে ঠিক করল মশলা দেওয়া পান খাওয়াবার জন্য গৌরীকে বলবে।

"তুমি ধুতি পর কেন ? এখানকার ছেলেরা ত প্যাণ্টই পরে।"

"এটা বাবার ধুতি।"

"মরা মানুষের জিনিস ব্যবহার করতে নেই।"

"করলে কি হয় ?"

"কিছুই হয় না, তবে লোকটার কথা মনে পড়ে যায়। তোমার মনে পড়ে না বাবাকে ?"

"কই না ত ! বাবা আমাদের সঙ্গে খুব কমই কথা বলত, আমরাও কাছে ঘেঁষতুম না।"

"এক একজন লোক ওই রকম হয়, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারে না ; আমার বাবাও ওই রকম।"

অনন্তের খাওয়া হয়ে গেছে। প্লেটে পড়ে আছে শুধু স্যালাড। খুঁটে খুঁটে সে বীট আর গাজরের কুচি মুখে দিতে লাগল পেঁয়াজ বাদ দিয়ে। গৌরী দু-আঙুল তুলে ছেলেটাকে বলল "চা।"

অন্য টেবলগুলো ভরে আছে। তাদের টেবলেও মুখোমুখি অফিসফেরত দুজন দু-কাপ চা নিয়ে বসে। তারা বৃষ্টি, রাস্তায় জমা জল নিয়ে কথা বলছে আর মাঝে মাঝে নিরাসক্তচোখে গৌরীর দিকে তাকাচ্ছে।

"আমার ছাদটা ফাটা, শোবার ঘর বোধহয় ভেসে গেছে।"

লোকটিকে উদ্বিগ্ন মনে হলেও ব্যস্ততা দেখা যাচ্ছে না বাড়ি যাবার জন্য। মনে হয় রোজই এই সময় এখানে এসে চা খায়।

অনন্ত গরম চায়ে চুমুক দিয়েই চমকে কাপ সরিয়ে নিল।

"জিব পুড়ল ত ?"

"এত গরম বুঝতে পারিনি।"

সে প্লেটে চা ঢেলে ফুঁ দিয়ে জুড়িয়ে নিয়ে খেল। গৌরী তাই দেখে শুধু হাসল। দরজার কাছের টেবলে দোকানের মালিক বসে। গৌরী ফ্রকের গলা দিয়ে হাত

ঢুকিয়ে ব্রেসিয়ারের ভিতর থেকে ছোট্ট একটা চামড়ার ব্যাগ বার করল।

"তিন টাকা চল্লিশ।"

অনন্ত কৌতূহল সামলাতে না পেরে আড়চোখে দেখল ব্যাগটার মধ্যে ভাঁজ করা কয়েকটা দু-টাকার নোট। পাঁচ টাকার নোটের রঙও দেখতে পেল। দুটো দু-টাকার নোট গৌরী টেবলে রাখল। মৌরী রাখা প্লেটে মালিক একটা আধুলি আর দশ পয়সা রাখল। ছেলেটা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গৌরী আধুলিটার সঙ্গে খানিকটা মৌরীও তুলে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। ইতস্তত করে অনন্তও দু-আঙুলের চিমটেয় মৌরী তুলল।

"দশ পয়সাটা নিলে না যে, বখশিস ?"

"হ্যাঁ।"

"সেলাম করল না ত !"

"দশ পয়সায় আবার সেলাম দেবে কি !"

রাস্তায় জল, ফুটপাথেও পায়ের গোছ ডুবে যাচ্ছে। জলের মধ্যে পা টেনে টেনে সাবধানে গর্ত খুঁজে খুঁজে লোকেরা হাঁটছে। বৃষ্টি-ধোওয়া গাছের পাতাগুলো ছাড়া আর সব কিছুই ম্লান। ঘোষ কেবিনের নিওন আলোয় গৌরীর গায়ের চামড়া ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। ভিজে চুল মাথায় বসা। ফ্রকটা ন্যাতার মত শরীরে ঝুলছে।

"কোনদিকে যাবে, বাড়ি ?"

"হ্যাঁ। তুমিও ?"

"চল তোমার সঙ্গে খানিকটা যাই।"

অনন্ত একবার ভাবল, চটি হাতে তুলে নেবে কিনা। সাত মাস আগে চার টাকা দিয়ে ফুটপাথের দোকান থেকে কেনা। স্ট্র্যাপ ঢিলে হয়ে গেছে জল ঠেলে যেতে যেতে যদি খুলে যায় ! গৌরীর পায়েও চটি কিন্তু হাতে তুলে নেয়নি। সে আর চটির কথা ভাবল না। ধুতিটা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে গৌরীর পাশাপাশি হেঁটে চলল।

"তোমার সঙ্গে বোধহয় কারুর ভাব নেই।"

অনন্ত বুঝতে পারল না গৌরী কি বলতে চায়। সে মাথা নেড়ে বলল, "না, আমি ছেলেদের সঙ্গে বড় একটা মিশি না।"

"ছেলে নয় মেয়ে। কারুর সঙ্গে তোমার ভাব নেই ?"

অপ্রতিভ হল অনন্ত। ভাব থাকাটা ভাল না মন্দ, উচিত কি অনুচিত, সে বুঝতে পারছে না।

"নাহ্, ওসব আমার নেই।"

"কি নেই ?"

গৌরী মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ওর চোখে হাসি। একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে আসছে জল ছিটিয়ে। তাদের সামনে যে-লোকটি যাচ্ছে সে ধমক দিয়ে উঠল। বোধহয় ছেলেটা শুনতে পেল না বা অগ্রাহ্য করল। গৌরী কাছে সরে এল। অনন্ত থমকে হাত বাড়িয়ে

ছেলেটাকে ধরতে গিয়ে পারল না।

"তুমি খুব ভাল ছেলে।"

"কি করে বুঝলে!"

"সে বুঝতে পারি। তুমি একদমই চ্যাংড়া নও।"

"আমার ঘাড়ের উপর একটা সংসার। তাদের দেখতে হবে তো।"

ওরা কিছুক্ষণ কথা বলল না। যত এগচ্ছে ফুটপাথের জল ক্রমশই কমে আসছে। ট্রাম বন্ধ। স্টপে এক একটা বাস থামছে আর ঝাঁপিয়ে পড়ছে মানুষ। গাড়ি আর পথচলতি লোকে রাস্তাটা বিশৃংখল হয়ে গেছে। দুধারে জল জমে থাকায় রাস্তার মাঝখান দিয়ে রিক্সা আর লোক চলছে। বাস, ট্যাক্সি বা বাড়ির মোটরের গতি মন্থর। স্রোতের মত মানুষ হেঁটে চলেছে শিয়ালদার দিকে।

দুজনে ফুটপাথের কিনার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রাস্তাটার জটপাকানো অবস্থা দেখছিল।

"তোমাকে একটা কথা বলব, কাউকে এ পর্যন্ত কিন্তু বলিনি।"

"কি কথা?"

গৌরী কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, "রমেনদার সঙ্গে আমি চলে যাব।···দমদমায় ঘর দেখে এসেছে।"

"সেকি!"

"কেন, মেয়েরা কি ভালোবেসে ঘর ছাড়ে না?"

"তোমার বয়স কত?"

"বয়স দিয়ে কি এসে যায়?"

"তোমার বাবা রেগে যাবে।"

"যাবে ত যাবে, আমার তাতে বয়েই গেল।"

"তোমার বিয়ে ঠিক করেছে।"

"কে করতে বলেছে? হাওড়ায় কোন এক গ্রামের ছেলে চাষা না কুলি কে জানে···রমেনদাকে বাবা কেন যে দেখতে পারে না জানি না।"

"যদি পুলিসে খবর দেয়?"

"দিক্ না, খুঁজে পেলে ত! তুমি কিন্তু কাউকে বোল না।"

"না।"

অনন্ত নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। গৌরী তাকে বিশ্বাস করেছে। নিশ্চয় কিছু একটা তার মধ্যে পেয়েছে বলেই। এই রকম আস্থা তার উপর এখন পর্যন্ত কেউ ত রাখেনি। কিন্তু রমেন লোকটাকে তার ভালো লাগেনি। গৌরীর উচিত হবে না ওর সঙ্গে চলে যাওয়া। তার মনে হল কথাটা বোধহয় এখন বলা ঠিক হবে না। সাহস করে ঘর ছাড়ছে, অমরও তাই করেছে।

মা কালকেও অমরের কথা বলেছে: 'ছেলেটা কোথায় গেল একটু খোঁজ কর্।' সে বলেছিল, 'কচি-খোকা নয়, ঠিকই আছে কোথাও, এখানের থেকে হয়ত ভালই আছে।'

গৌরীর বাড়িতেও এইভাবে কথা হবে নিশ্চয়।

"তোমার মা কষ্ট পাবে।"

"তা পাবে। আমি চিঠি লিখে যাব।"

"কবে যাবে?"

"এখনও দিনটিন ঠিক করিনি, টাকাপয়সা ব্যবস্থা করার ব্যাপার আছে তো, সংসার পেতে বসার জন্য সবই ত কিনতে হবে।···তোমায় যাবার আগে বলব। এখন যাই, আর আসতে হবে না।"

"আমায় বলবে কি করে?"

"ভাইয়ের হাতে চিঠি দোব, যখন খেতে আসবে তোমায় দেবে···চলি।"

গৌরী রাস্তা পার হয়ে চলে যাচ্ছে। ভিড়ের মধ্য দিয়ে তার নিতম্বের দোলা, আর ফ্রকের গাঢ় নীল ফুলছাপ আর ভিজেচুল যতক্ষণ দেখা যায় অনন্ত দেখার চেষ্টা করল। আশা করেছিল একবার অন্তত পিছন ফিরে তাকাবে, কিন্তু গৌরী তাকায়নি। এতক্ষণ যে মধু আঁচ তার মনকে তাজা ঝরঝরে করে রেখেছিল গৌরী চলে যাওয়ামাত্র সেটা নিবে আসছে। ওর চলে যাওয়ার মধ্যে কেমন একটা নিষ্ঠুর ভঙ্গি রয়েছে যাকে বলা যায় নিষ্ঠুরতা। তবে ওর মায়া-মমতাও আছে। একবার আলুর দমের দাম নেয়নি, আজও খাই খাওয়াল। অথচ কি এমন তার সঙ্গে পরিচয়? পাঁচ মাস ধরে দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য দেখা হওয়া আর কয়েকটা সাধারণ কথাবার্তা! কত সহজভাবে তার সঙ্গে কথা বলল আজ। কত তাড়াতাড়ি তাকে বিশ্বাস করেছে নয় ত বাড়ি থেকে পালাবার কথা কি বলত?

একটা গুপ্ত খবর জেনে যাওয়ার এবং সেটাকে কোনমতেই প্রকাশ না করার সংকল্প তাকে তৈরী হওয়া চাপ তার মধ্যে উত্তেজনা এনে দিয়েছে। বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে হাঁটতে অনন্তের মনে পড়ল পান খাওয়াবার জন্য গৌরীকে আর বলা হল না। মুখে কি গন্ধ হয়েছে? নিজের মুখের গন্ধ টের পাওয়া যায় না। হাতের চেটোয় ভাপ দিয়ে সে শুকল, কিছু বুঝতে পারল না। তাইতে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। সে ঠিক করল আজ সবার সঙ্গে দূর থেকে কথা বলবে। মুখটা অন্যদিকে ঘোরাবে মা যখন ঝুঁকে থালায় কিছু দিতে থাকবে।

কিংবা বলেই দেবে গৌরী তাকে খাইয়েছে। কে গৌরী? চাওয়ালার মেয়ে, রোজ ওর সামনে বেঞ্চে বসে আলুর দম দিয়ে রুটি খাই, তখন কথাবার্তা বলি। নানান রকমের কথা, সিনেমা, জামাকাপড়, হাঁটার স্টাইল, পুরুষদের কত রকমভাবে মেয়েদের দিকে তাকানো, বাড়িওয়ালাদের বদমাইসি, আরো অনেক রকম কথা। খুব ভাল মেয়ে একদমই গায়েপড়া নয়। বয়স? প্রায় সমানই কিংবা দু-এক বছরের ছোট।

মা কিভাবে নেবে? খারাপ কিছু ভাববে কি? সন্দেহ করার মত মন মায়ের নয়। তা যদি হতো তাহলে নিশ্চয় জেনে যেত মিনু নামে একজনের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক ছিল।

অনন্ত যখন বাড়ি পৌঁছল শীলা তখন অবিনাশের সঙ্গে কথা বলছে। অনু ঘরে নেই,

বোধহয় পাশের বাড়িতে কিংবা দোতলায় আর অলু তক্তাপোশের এককোণে কাত হয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছে। ভিজে শার্ট আর ধুতি উঠোনের তারে মেলে দিয়ে অনন্ত ঘরে আসতেই অবিনাশ বলল, "রাস্তার জল কমেছে ?"

"এদিকে বিশেষ জল জমেনি। আমাদের ওদিকটায় খুব জমেছে।"

"ঠাকুরপো অনেকক্ষণ এসেছেন, অফিসে নাকি লোক নেবে, তাই বলছিলেন·

"কিন্তু ও ত স্কুল ফাইনালটাও পাস করেনি, টাইপও জানে না।···তাই বলছিলুম প্রাইভেটে পরীক্ষাটা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আর সেইসঙ্গে টাইপটাও শিখে নিলে ভালো। এমপ্লয়ির ছেলে, ধরাধরি করলে হয়ে যাবে ইউনিয়নও এসব ক্ষেত্রে বাগড়া দেবে না, আমি কথা বলেছি। তুই সামনের বছরই পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হ। এখানে না হোক অন্য কোথাও চেষ্টা করা যাবে। কোয়ালিফিকেশন না থাকলে তো কোথাও কিছু পাবি না। দপ্তরির কাজ করে কত টাকা আর পাবি, নিজে কারবার খুলেও যে কিছু করবি তাও সম্ভব নয়।"

"না, আমি দপ্তরীখানা ছেড়ে দেব, এখানে আমার ভবিষ্যৎ নেই।"

অনন্ত ভারী গলায় বিজ্ঞের মত তার সিদ্ধান্ত জানাল। শীলা চকিতে একবার অলুর দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "মেয়েদের বিয়ের টাকা ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছি। তাও তো একদিন শেষ হয়ে যাবে, তারপর ?"

অবিনাশ মেঝের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হল। অনন্ত একদৃষ্টে দেয়ালে চোখ রাখে. কোলের উপর হাতদুটি। শীলা এই নীরবতাকে ভাঙার চেষ্টা করল না।

"অমরকে যেতে দেওয়া ঠিক হয়নি।"

দুজনে অবিনাশের মুখে জিজ্ঞাসু চোখ রাখল।

"ওকে ওইভাবে অপদস্থ করা অনন্তর উচিত হয়নি...জীবনে এসব জিনিস বহু ঘটে, সামান্য ব্যাপার, তাই নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি...ছেলেটার মনে খুবই লেগেছে।"

অনন্ত মাথা নামাল। তারও একসময় মনে হয়েছিল, সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। অনুতপ্ত বোধ করে ভেবেছিল অমরের খোঁজ নেবে পাড়ায় ওর বন্ধুদের কাছে অথবা কলেজে। কিন্তু কিছুই সে করেনি।

"কোথায় গেছে ?"

"জানি না।"

"ও থাকলে, চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই সংসারটাকে মোটামুটি নিশ্চিন্ত করে দিতে পারত।"

অনন্তের মনে হল, আর একটা বোঝা তার ঘাড়ে এসে পড়ল। সংসারের নিশ্চিন্ত হওয়ার একটা পথ ছিল কিন্তু তার জন্যই সেই পথ হারিয়ে গেল। এখন তার উপরই দায়িত্ব পড়ল আবার পথ বার করে নিশ্চিন্তি এনে দেওয়ার। নিশ্চিন্তি মানে টাকা রোজগার করতে হবে কিন্তু কিভাবে করবে ?

"আমাকে তাহলে স্কুল ফাইনাল পাস করতে হবে ?...কিন্তু আমি তো সব ভুলে গেছি।"

তার করুণ স্বর অবিনাশের গম্ভীরমুখে হাসি ফোটাল। অলু একবার বই থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

"বই যোগাড় কর। পারিস তো একটা কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে যা। রোজ যদি আটচারেক করেও বই নিয়ে বসিস তাহলে ছ'মাসেই তৈরি হয়ে যাবি, পারবি না ?"

অনন্ত শুধু তাকিয়ে রইল। ঠিক এইভাবে এই ঘরেই সে একদিন শুনেছিল, 'ভাগ্য যদি অন্যরকম অবস্থায় ফেলে দেয় তাহলে আর কি করার থাকতে পারে। মা'কে দেখা, ভাইবোনদের মানুষ করে তোলা, নিজেকে নিজে বড়ো করা...'

সে মুখ নামিয়ে বুকের মধ্যে আটকে রাখা বাতাস নাক দিয়ে বার করার সময় বলল, দেখি।"

"দেখি আবার কি ? তোর মত ভাল ছেলের না পারার তো কথা নয় !"

"পারবে না কেন, খুব পারবে।"

শীলা এমন এক সরল প্রত্যয় নিয়ে বলল যে ভয় পেয়ে অনন্ত রেগে উঠল। তীক্ষ্ণ-চোখে সে তাকাল।

"আমার পড়াশুনোর ব্রেন নেই, থাকলে কি ফেল করতুম ?"

"তোকে তো ফার্স্ট-সেকেণ্ড হতে হবে না, শুধু পাসটা করতে হবে চাকরি পাবার জন্য। খাটলেই পাস করা যায়।"

অনন্ত আবার মুখ নামিয়ে ফেলল। তাকে আবার বই নিয়ে বসতে হবে। আবার অঙ্ক, গ্রামার, এসে, সংস্কৃত, লেটার রাইটিং, মুখস্ত আর মুখস্ত। ভাল ছেলেরা পারে, পারতেই হয়, তাদের বড় হতে হয়, সবাইকে দেখতে হয়।

ক্লান্তচোখে সে তার ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে তাকিয়েই যেন বলল, "ঠিক আছে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ছ'মাসে নয়, অনন্ত প্রথমবার ফেল করে পরের বার কোনক্রমে পাস করেছিল। কিন্তু তারই মধ্যে জীবন একটা বাঁক নিয়ে কিঞ্চিৎ স্বস্তি এনে দেয় তাদের সংসারে। সে আড়াইশো টাকার একটা চাকরি পেয়ে যায়।

সেদিন অশোকবাবুর কোচিং থেকে ফিরতে তার রাত হয়ে গেছল। তাকে আটকে রেখেছিলেন একটা প্যাসেজ ইংরাজীতে। নির্ভুল অনুবাদ করাবার জন্য। একসময় বিরক্ত হয়ে তিনি বলে ওঠেন, "বাড়ি যা, তোর দ্বারা এসব হবে না। তোর ভাইয়ের পেছনে এর ওয়ান-টেন্থও খাটতে হয়নি অথচ কি রেজাল্ট করল, আর তুই..."

অনন্ত বিষণ্ণমনে বাড়ি ফেরার সময় ঠিক করে ফেলে প্রত্যেকদিন ভোরবেলায় সে একপাতা করে গ্রামারও মুখস্ত করবে।

বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র শীলা ব্যস্ত হয়ে বলল, "উৎপলদের চাকরটা তোকে ডাকতে এসেছিল, ওর বাবার কি যেন দরকার তোকে। এলেই যেতে বলেছে, কিজন্য তা আর বলল না।"

অনন্ত অবাক হয়ে বলল, "আমাকে! ব্যাপার কি? আমার সঙ্গে তো ওনার জীবনে কখনো কথা হয়নি।"

তারপরই মনে পড়ল সন্দেশগুলো সে ওঁকেই ফেরত দিয়েছিল তখনই প্রথম দু'চারটে কথা বলেছিলেন। উৎপলের বাবা সাধন বিশ্বাস পেশায় অ্যাটর্নি। কাঁচাপাকা চুল, কখনো ইস্ত্রিবিহীন পাঞ্জাবি বা পাজামা পরেন না। গালদুটি সর্বদা মসৃণ, পায়ে চটি। একটা ভক্সহল মোটরে অফিসে বেরোন। সন্ধ্যার পর একতলার ঘরে ওঁকে দেখা যায় চামড়ামোড়া গদির চেয়ারে বসে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে। ঘরের এককোণে পিছন ফিরে একটা লোক টাইপ করে যায় রামকৃষ্ণদেবের ছবিটার নীচে চেয়ারে বসে।

"গিয়ে দেখ না একবার, ঘরে তো আলো জ্বলছে।"

শীলার মত অর্নু-অলুও উদ্‌গ্রীব চোখে তাকিয়ে। সে নিজেও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ওদের মত।

সাধন বিশ্বাসের ঘরের দরজা থেকে সে সন্তর্পণে উঁকি দিল। টাইপিস্ট তার কাজে ব্যস্ত। সাধন বিশ্বাস চেয়ারে হেলান দিয়ে মনোযোগে কি একটা পড়ছেন। সে বুঝে উঠতে পারছে না এখন তার কি করা উচিত।

উনি মুখ তুললেন এবং দ্রুত আড়ালে সরে-যাওয়া অনন্তের উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, "কে ওখানে?" সাড়া না পেয়ে আবার বললেন, "ওখানে কে?"

"আমি সামনের বাড়ির অনন্ত।"

চেনার জন্য কয়েক সেকেণ্ড মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "ও, এসো।"

অনন্ত পা টিপে ঘরে ঢুকল। মোজাইকের ঝকঝকে মেঝেয় ফুলের নকশা, মাড়াতে অস্বস্তি হয়। চেয়ারের পিঠ ধরে সে দাঁড়াল।

সাধন বিশ্বাসের ঠোঁটে হাসি দেখে সে বিভ্রান্ত হল, কোন ধারণায় আসতে পারছে না

কেন তাকে ডেকেছেন!

"দেরী করলে যে?"

"কোচিং থেকে ফিরতে ফিরতে..."

"কি পড়তে যাও?"

"প্রাইভেটে স্কুল ফাইনাল দোব...দেবার ইচ্ছে আছে।"

"সারাদিন কি করো?"

"একটা দপ্তরিখানায় কাজ শিখতে যাই।"

"অ্যাপ্রেন্টিশ?...কত পাও?"

অনন্তর চোখে ভেসে উঠল গৌরীর মুখটা আর সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল, 'য়্যাঁ, মোটে চল্লিশ!' টাকার পরিমাণটা অসম্মানজনক যে কেউ শুনলেই তার সম্পর্কে ধারণা নীচে নামিয়ে দেবে।

"কমই দেয়...একশো চল্লিশ।"

একবার মুখের দিকে তাকিয়ে সাধন বিশ্বাস কলমটা টেবলে ঠুকতে শুরু করলেন। অনন্ত ভয় পেল, মিথ্যাটা কি ধরে ফেলেছেন? হয়তো কোনভাবে শুনেছেন সে কত পায়।

"একটা চাকরি আছে, সৎ আর বিশ্বাসী লোক দরকার, তোমার কথা মনে পড়ল। করবে?"

"কি কাজ?" অনন্তের শ্বাসকষ্ট শুরু হল।

"আমার বন্ধু আবার ক্লায়েণ্টও, কলকাতায় অনেক বিষয়সম্পত্তি আছে, বস্তি আছে একটা, বাড়ি আছে গোটাচারেক, নতুন একটা ফ্ল্যাটবাড়িও তৈরি করছে পার্ক সার্কসে, শিবপুরে পেট্রল পাম্প, দেশে জমিজমা সিনেমা হল আছে, তাছাড়া কয়লার ব্যবসা, ওষুধের দোকান...নিজে কিছুই দেখে না, বনেদী বড়লোক হলে যা হয়, কর্মচারীরাই সব দেখে আর দু'হাতে চুরি করে...সে থাকগে, ওর এস্টেটে একটা চাকরি খালি আছে, করবে?"

"কি চাকরি?"

"ভাড়া আদায় করার। এতকাল যে করতো তাকে সরিয়ে ওষুধের দোকানে বসাচ্ছে, বাবার আমলের লোক তাই আর ছাড়ায়নি। কাজটা টাকাপয়সা নিয়ে। ভাড়া কালেকশন করতে টেনাণ্টদের ঘরে ঘরে যাওয়া, ভাড়াটেদের দেখাশোনা, বাড়ির মেরামতি, ট্যাক্স দেওয়া, আদায়ের হিসাবপত্তর রাখা, টাকা জমা দেওয়া, এই হল কাজ। কিন্তু চুরির সুযোগ আছে তাই একজন সৎ বিশ্বাসী লোক এখুনি চাই। আজই কথা হচ্ছিল, আমি বলেছি আমার জানা একটি ভালো ছেলে আছে, সামনের বাড়িতেই থাকে।...করবে?"

উনি কি করে জানলেন আমি ভাল ছেলে? অনন্ত অবাক হল। বোধহয় সন্দেশ ফিরিয়ে দেওয়ার ঘটনা থেকেই ওঁর ধারণা হয়েছে। বহুদিন সে মনে মনে আক্ষেপ

করেছে, অমরকে ওভাবে চোর প্রতিপন্ন না করালেও হতো, হাজার হোক ভাই তো। কিন্তু এখন তার মনে হল শাপে বরই হয়েছে।

"হ্যাঁ করব।" কোনক্রমে কথাটা সে বলতে পারল। হাঁটুদুটো মাখনের মত লাগছে হয়তো সে দুমড়ে পড়ে যাবে। চেয়ার আঁকড়ে থাকা আঙুলগুলোর গাঁট টনটন করে উঠল।

"এখন যা পাচ্ছ তার থেকে বেশিই যাতে পাও দেখব। বোস, একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, কালই কি যেতে পারবে? সকাল দশটার পর...তার আগে ঘুম থেকে ওঠে না।"

অনন্ত মাথা হেলাল কিন্তু চেয়ারে বসল না। সাধন বিশ্বাস কলমদানি থেকে লাল কলমটা তুলে তাঁর নাম ছাপা প্যাডে যতক্ষণ ধরে চিঠি লেখায় ব্যস্ত রইলেন ততক্ষণ সে নিজের হৃদপিণ্ডের ধকধকানি ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না, চোখে একটা ঝাপসা পর্দা নেমে এসেছে যার ওধারে সাধন বিশ্বাসকে ছায়ার মত লাগছে।

চিঠিটা চার ভাঁজ করে এগিয়ে দিলেন।

"দেরী কোর না কালই যাও।"

টেবলটা দ্রুত ঘুরে গিয়ে অনন্ত নিচু হল প্রণাম করতে। হরিণের চামড়ার চটির মধ্যে পা ঢোকান। গোড়ালিদুটো যেন শ্বেত পাথরের। চামড়ার উপর আঙুল বোলাবার সময় সিরসির করে উঠল তার মেরুদণ্ড।

"থাক্ থাক্...ভাল করে কাজ কোর।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"খুব বেশি দূরে নয়, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটে পরেশনাথ মন্দিরের কাছেই, ঠিকানা লিখে দিয়েছি...সমীরেন্দ্র বসুমল্লিক, ফটকে লেখা আছে অঘোর এস্টেট...ওর ঠাকুর্দার নাম।"

সদর দরজায় অনু দাঁড়িয়ে, তার পাশে শীলা। তার জন্যই অপেক্ষা করছে। সাধন বিশ্বাসের ঘরটার আধখানা এখান থেকে দেখা যায়।

"দাদা, তোকে কি লিখে দিল রে?"

অনন্ত দুজনের মুখের দিকে বিহ্বলচোখে তাকিয়ে শুধু বলল, "ভগবান আছে।"

তিনজনে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। চেয়ারে হেলান দিয়ে সে প্রত্যেকের মুখের দমবন্ধ কৌতূহল তারিয়ে তারিয়ে চাখল।

"বললেন একটা চাকরি আছে, করবে?"

"কি বললি?"

"করব বললুম।"

"কোথায়, কিসের চাকরি, কত দেবে?"

সেদিন রাতে অনন্ত ঘুমের মধ্যে বারবার ছটফট করল। সকালে ঘুম ভেঙে যেতেই সে পাশের ঘরে কথাবার্তার শব্দ পেল।

"ইস্ত্রি না করলে এই পরে যাবে নাকি? চেয়ে আন ইস্ত্রিটা। চটি জোড়ায় কালি দিয়ে

দে।"

রাতে উঠোনে ধুতি আর শার্ট নিয়ে মা সাবান দিতে বসে। দোতলা থেকে তখন জেঠিমা চেঁচিয়ে বলেছিল, "এত রাতে কাচাকুচি করছ যে?"

"অনন্ত কাল নতুন চাকরিতে জয়েন করবে।"

চিৎ হয়ে অন্ধকার ঘরে সে হেসেছিল। চাকরিই হোল না আর কি না জয়েন?

"কোথায় গো?"

"এক জমিদারের আপিসে।"

অঘোর-এস্টেট খুঁজে নিতে অনন্তর অসুবিধা হয়নি। লোহার ফটক থেকে মাটির পথ অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে বারান্দার নিচে পৌঁছেছে। টানা তিন ধাপ সিঁড়ি, ডানদিকে বেলে পাথরের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে, বাঁদিকে পরপর কয়েকটা ঘর, সামনে পাথরের উঠোন আর ঠাকুর দালান।

সিঁড়ির পাশে একটা বেঞ্চে দুটি লোক বসে। চাহনি আর বসার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় বাইরের লোক, কোন কাজের জন্য এসেছে। বাঁ দিকের ঘরগুলো থেকে লোকজনের গলা পাওয়া যাচ্ছে। অনন্ত উঁকি দিয়ে দেখল প্রথম ঘরটার অর্ধেক জুড়ে নিচু তক্তাপোশ, তাতে শতরঞ্চি পাতা। জানলার কাছে বাবু হয়ে বসে এক প্রৌঢ়, কোলের কাছে রাখা ডেস্কে ঝুঁকে একটা কাগজ থেকে দেখে দেখে খাতায় লিখছে। ঘরের কড়িকাঠ থেকে লোহার শিকে আটকান দু সারি কাঠের তাক ঝুলছে, মোটা মোটা ধুলো লাগা খাতা আর কাগজপত্রে সেগুলো ঠাসা। পাশের ঘরটায় কয়েকটা টেবল-চেয়ার। নানান রকমের কাগজে আর খাতায় টেবলগুলো ভরা। দেখে মনে হয় না ওগুলো কখনও নাড়াচাড়া করা হয়েছে। দুটো স্টিলের আলমারি ছাড়াও কাঠের র‍্যাক তিনদিকের দেয়াল ঢেকে ফেলেছে। এখানেও খাতা আর কাগজ। পুরনো একটা পাখা কিচকিচ শব্দ করে ঘুরছে। পিছন ফিরে একটি লোক চেয়ারে বসে।

অনন্ত বুঝতে পারছে না সমীরেন্দ্র বসুমল্লিকের সঙ্গে সে কিভাবে দেখা করবে। কোন চাকর বা দারোয়ানকে দেখতে পাচ্ছে না। এত বড়লোক এত বিষয়সম্পত্তি, সে ভেবেছিল দেখবে ঝকঝকে সাজানো অফিস, লোকজন গিজগিজ করছে। তার বদলে এমন নির্জন পুরনো একটা বাড়ি, যার মেঝেয় সিমেন্টের চটা ওঠা, দেয়ালে নোনা, জানালা দরজার কাঠ ময়লা, সার্সির কাচ ভাঙা—দেখে সে দমে গেল।

"কি চাই?"

অনন্ত ঘরে ঢুকল। প্রৌঢ় চশমাটা আঙুল দিয়ে ঠেলে নাকের উপরে তুলে তার দিকে তাকিয়ে।

"সমীরেন্দ্র বসুমল্লিকের সঙ্গে দেখা করব।"

"কি দরকার?"

"একটা চিঠি এনে

"কার কাছ থেকে?

"সাধন বিশ্বাস, অ্যাটর্নি।"

প্রৌঢ় হাত বাড়াল।

"দেখি।"

অনন্ত চিঠিটা দিতে চটি খুলে তক্তাপোশে উঠল। চিঠিটা ইংরাজীতে। তাতে অল্প কথায় লেখা, যে-ছেলেটির কথা বলেছি তাকে পাঠালাম। অনেকক্ষণ ধরে পড়ার পর প্রৌঢ় তার আপাদমস্তক দেখে হাঁক দিল, "যুগল"। কোথাও কোন সাড়াশব্দ নেই শুধু দোতলা থেকে কুকুরের ডাক শোনা গেল। প্রৌঢ় এবার গলা চড়িয়ে ডাকল।

"কি বলছেন?"

দরজায় দাঁড়িয়ে ধুতি-গেঞ্জি পরা একটি লোক, প্রৌঢ়রই বয়সী। বোঝা যায় পুরনো চাকর।

"দেখা করতে এসেছে, অ্যাটর্নিবাবু চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছেন।"

যুগল চিঠিটা নিয়ে দোতলায় উঠে গেল। মিনিট দুয়েক পর নেমে এসে বলল, "যান।"

সিঁড়িটা বাঁক নিতেই সামনের দেয়ালে মানুষ প্রমাণ একটা আয়না। কাচের বহু জায়গায় কালো ছোপ পড়েছে। সোনালী চওড়া ফ্রেমটা বিবর্ণ। অনন্ত নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখতে পেল। এই প্রথম সে জানতে পারল নিজের পুরো চেহারাটা কেমন।

সিঁড়িটা পৌঁছেছে লম্বা একটা দালান ঘরের প্রান্তে যার অপর প্রান্তে কয়েকটা সোফা এবং গদি আঁটা পুরনো চেয়ার ও নীচু টেবল। পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পরা গৌরবর্ণ, সুদর্শন একটি লোক সোফায় হেলান দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন, পায়ের উপর পা তোলা। একটা আলসেশিয়ান কার্পেটের উপর দেহ ছড়িয়ে দু পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে, অনন্তকে সে চোখ তুলে একবার দেখল মাত্র।

টেবলে সাধন বিশ্বাসের চিঠিটা একটা অ্যাশট্রে দিয়ে চাপা। অনন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। একসময় কাগজটা মুখের সামনে থেকে সরিয়ে তাকালেন, চোখের মণিদুটো বিষণ্ণ, গভীর ও বড়ো। ঘুমের রেশ তখনো জড়িয়ে রয়েছে।

অনন্ত ঠিক করে রেখেছিল প্রণাম করবে। করতে পারল না। কি যেন একটা নিস্পৃহ দূরত্ব মানুষটির অচঞ্চল ভঙ্গি থেকে তৈরি হয়ে রয়েছে, যা ভেদ করে এই ঘর, আসবাব, এমনকি বাইরের পৃথিবীও লোকটির কাছাকাছি যেতে অক্ষম। সে বুকের কাছে দুই মুঠি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। এই লোকটির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর তার জীবনের ধারা বদলাবে।

"বয়স কত...কুড়ি?"

অনন্তের ভরসা হল না কথা বলতে। শুধু হাসল।

চিঠিটা তুলে চোখ বোলালেন, একবার তাকালেন অনন্তের দিকে। কয়েক সেকেণ্ড কি ভাবলেন।

"নিচে গিয়ে বোস, আর অজয়বাবুকে পাঠিয়ে দাও।"

কে অজয়বাবু সে জানে না, নীচের ঘরের প্রৌঢ়ই সম্ভবত। সিঁড়িতে সে মুখ ফিরিয়ে আয়নায় আবার নিজেকে দেখল। এই কয়েক মিনিটে তার মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হল না। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে তার মনে পড়ল নমস্কার করে আসা হয়নি।

প্রৌঢ়ই অজয়বাবু। পরে জেনেছে ওর পুরো নাম অজয় হালদার। দোতলায় উঠে গিয়েই তাকে প্রায় তখুনি নেমে আসতে দেখে অনন্তের বুক কেঁপে উঠল। এত তাড়াতাড়ি ফিরে এল, তার মানে, বিদায় করে দাও! বেঞ্চে বসা লোকদুটিকে ইশারায় উপরে যেতে বলে অজয়বাবু গম্ভীরমুখে নিজের জায়গায় বসে বলল, "তোমার নাম কি?"

"অনন্তকুমার দাস।"

"বাবার নাম?"

"ঈশ্বর শক্তিপদ দাস।"

"বড় ছেলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কে কে আছে?"

"মা, এক ভাই, দুই বোন। আমি বড়।"

"কদ্দুর লেখাপড়া?"

"স্কুল ফাইনাল দোব, প্রাইভেটে...রাতে কোচিংয়ে পড়ি। বাবা হঠাৎ বাস অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলেন, তাই স্কুল...টাকাপয়সা কিছু রেখে যাননি।"

"ঘটি না বাঙাল?"

"ঘটি।"

"এখানে বসে কাজ করার মত ব্যাপার খুবই কম। যখন জমিদারী ছিল তখন এখানে কাজ ছিল, অনেক লোকও ছিল। এখন যা কিছু ব্যবসার কাজটাজ ধর্মতলা স্ট্রিটের অফিস থেকে হয়। বুলুবাবু ওখানেই বসেন।"

অজয়বাবু চশমায় ঠেলা দিয়ে জানলার বাইরে তাকাল। অনন্ত মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ধান ভানতে শিবের গীত গাইছে, কাজটা হবে কি হবে না সেটা আগে বলুক। প্রৌঢ় জানলা থেকে চোখ ঘরের মধ্যে এনে তাকের উপর দিয়ে বিষণ্ণ চাহনি বুলিয়ে অনন্তের মুখে বসাল।

"তুমি কাল থেকে কাজে এসো। যা করার সব কাল বুঝিয়ে দেব।"

"এই সময়ে আসব?"

"তাই এসো। আসল কাজ বাইরে, ভাড়াটেদের কাছ থেকে ভাড়া আদায়। অনেক টাকা মার গেছে, বছরের পর বছর ভাড়া বাকি, আদায় হয়েছে জমা পড়েনি...ভাড়াটে আছে কিন্তু আমাদের খাতায় নাম নেই অথচ তার কাছ থেকে ভাড়া আদায় হচ্ছে...এইসব। ভাল ভাড়াটেও আছে। রাজাবাজারের বস্তিটা গণিকে লীজ দেওয়া,

গণির ভাড়ার টাকা মাসে মাসে ঠিক এসে যায়। এন্টালি আর আহিরিটোলার বাড়ি-দুটোতেই যত ঝামেলা। সব পুরনো ভাড়াটে, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে এক একজন বাস করছে। আর দুটো বাড়ি টেরিটি বাজারে, সবই অফিস, ঠিক সময়ে দিয়ে দেয়।"

অজয়বাবু নীচু স্বরে ধীরে ধীরে যা বললেন তার বেশীর ভাগই অনন্তের কানে পৌঁছল না। সে বুঝে গেছে কাজটা সে পেয়েছে, সত্যিকারের একটা চাকরি। সংসারের মাথার উপর এবার একটা চালা বসল।

ধীরে ধীরে তার চোখ জলে ভরে এল। কার কাছে সে কৃতজ্ঞতা জানাবে? সমীরেন্দ্র বসুমল্লিক...অজয়বাবু...সাধন বিশ্বাস নাকি অমর?

"এস্টেটের নিয়ম হয়েছে ধর্মতলা অফিসের মত এখানেও একই স্কেলে মাইনে দেওয়া হবে।...প্রথম ছ'মাস প্রোবেশনার, থোক আড়াইশো পাবে।"

"কত?"

অজয়বাবু আবার বলল, অনন্তের কানে এল মা যেন বলছে, 'আর একটু ভাত নে।'

"কাঁদছ কেন?"

"রাতে আমার ঘুম হত না। কি করে সংসারটা চালাব ভেবে পেতাম না। সবাই আমার মুখ চেয়ে আছে, বড় ছেলেই তো বাবার জায়গা নেয়।"

"ছ'মাস পর যদি পাকা হও তখন হাতে তিনশো টাকার মত পাবে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

॥ ৬ ॥

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেদিন চারপাশের বাড়ি, মানুষ, যানবাহন, দোকান, ফেরিওয়ালা এমনকি রাস্তার জঞ্জালও তার কাছে নতুন এবং বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল। অসহায়ভাবে সে বুঝতে পারছিল না তার পৃথিবীটা হঠাৎ বদলে যাচ্ছে কেন! তার বোধের আয়ত্তে থাকছে না কেন? সে কোথাও কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে মানুষ এবং বাড়িগুলো একটু ছোট হয়ে গেছে, অথচ সবই রয়েছে পুরনো শৃঙ্খলা মেনে।

সেদিন হাঁটতে গিয়ে তার পদক্ষেপ বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। লোকে কি মাতাল ভাববে? সে আপনমনে হেসে ইচ্ছে করে আরো এলোমেলো পা ফেলেছিল। জামার হাতায় চোখের জল মুছেছিল। কি অদ্ভুতভাবে একটা নতুন রাস্তা তার সামনে এসে গেল। এই রাস্তা ধরে তাকে সাবধানে এগোতে হবে, সংসারটাকে সঙ্গে নিয়ে।

ছ' মাস না হলে চাকরিটা পাকা হবে না। ছ' মাস সে খুব ভাল কাজ দেখাবে, খাটবে আর কোন প্রলোভনেই টলবে না। এই কাজে নাকি চুরির সুযোগ আছে, নিশ্চয় তার উপর লক্ষ্য রাখা হবে। রাখুক।

অনন্ত নানান অজানা রাস্তায় সেই দুপুরে হেঁটেছিল, বহুক্ষণ। সে জানে হারিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। প্রত্যেকটা গলি তাকে এক সময় চেনা রাস্তায় পৌঁছে দেবেই। এক সময় সে পৌঁছেও গেছল বাড়িতে। মা তখন মেঝেয় ঘুমোচ্ছিল। নিঃশব্দে জামা খুলে আলনায় রেখে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল মা'র চোখ খোলা, চাহনিতে ভয়। ফিসফিস করে বলল:

"কি হলো রে?"

"হয়েছে।"

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল শীলা। ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "ভগবানকে সকাল থেকে ডাকছিলুম, মন বলছিল হয়ে যাবে। কত টাকা দেবে?"

বিকেলে অনন্ত রকে বসে বহু দিন পর ছেলেদের রবারের বল খেলা দেখল। নিজেকে তার হালকা লাগছে। কি বিরাট চাপে এতদিন কুঁকড়ে ছিল আজ সে বুঝতে পারছে। পাড়ার লোকেদের মুখোমুখি হতে এবার তার আর সঙ্কোচ নেই। এখন সে মোটামুটি রোজগেরে, জীবনের সঙ্গে জড়ানো কিছু কিছু পরিস্থিতির সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা তার হয়েছে। তবে এটুকু জানে, প্রথম মাসের মাইনে না পাওয়া পর্যন্ত তাকে আগের মতই টেনেটুনে চলতে হবে।

প্রসাদ ঘোষকে তার জানিয়ে আসা উচিত ছিল, আর সে কমলা বাইগার্সে যাবে না। অঘোর এস্টেট থেকে বেরিয়ে প্রথমে ওখানেই যাওয়া দরকার ছিল অথচ তখন তার একদমই মনে পড়ল না! আঠারো দিনের কাজের টাকা পাওনা হয়েছে। কাল ন'টার মধ্যে গিয়ে জানিয়ে আসবে। টাকা নিশ্চয় তখুনি দেবে না, ঘোরাবে। কোন পাওনাদারকেই একবারে টাকা দেয় না।

তাছাড়া, গৌরীর কাছেও খবরটা পৌঁছনো দরকার। আড়াইশো টাকার চাকরি

পাবার যোগ্যতা যে তার আছে এটা ও জেনে যাক। ওর অবাক হওয়া মুখটা কেমন দেখাবে কে জানে! কিন্তু ও তো আর দোকানে আসে না, ভাইকে বলে দিলেই হবে। গৌরী বলেছিল, ভাইয়ের হাত দিয়ে চিঠি দেবে। সে চিঠি আর পাওয়া হবে না, হয়তো আর কোনদিন তাদের দেখাই হবে না।

সে বিমর্ষ হয়ে থেকেছিল কিছুক্ষণের জন্য। গৌরীর সঙ্গে সম্পর্কটা বন্ধুত্বই, এমন আলাপ যে কোন ছেলের সঙ্গেও হতে পারত। অনন্ত মন থেকে গৌরীকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল। জীবনের এই সময়টায় কোন মেয়ের কথা ভাবলে তার চলবে না, তাকে উন্নতি করতে হবে। তাছাড়া, গৌরী তো ভালবাসে আর একজনকে। দরকার কি ওকে নিয়ে আজেবাজে ভাবনায়।

অনন্ত তার পরবর্তী সতেরো বছরে সংসার আর চাকরি ছাড়া, আর কিছু ভাবেনি। কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে, সে নাড়া খেয়েছে, বিভ্রান্ত হয়েছে, দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু তার জীবনধারায় কোনটিই বাঁক ফেরাতে পারেনি কিংবা হয়তো সে বাঁক নিতে চায়নি। তার নিজস্ব জগতের বাইরে যেতে সে ভয় পায়। একটা নির্দিষ্ট খাতের মধ্যে সে জীবনকে ঢেলে দিয়েছিল এবং বছরের পর বছর খাতটাকে শুধু গভীরই করেছে, কখনো উপচে পড়ার বা বদলাবার চেষ্টা করেনি। সে শুধু ভালো ছেলে হয়ে থাকার চেষ্টা করেছে।

এণ্টালিতে অঘোর ভবনের ভাড়া আদায় করতে গিয়ে প্রথম দিনে তার বুকের মধ্যে কাঁপন ধরেছিল। প্রত্যেকেই তাকে দেখে অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। এ আবার কে? অনন্ত জানতো প্রথমটা এ রকমটা হবেই।

"পরিমলবাবু কোথায়? আপনি কে?"

"আমি পরিমলবাবুর জায়গায় কাজ করছি, তাকে এখন অন্য কাজে দেওয়া হয়েছে।"

রাস্তার উপর কাঁচ ও আয়নার দোকানের মালিক নারায়ণ দত্ত যেন ভাবনায় পড়ে গেল এমনভাবে মাথা চুলকে অনন্তর দিকে তাকাল।

"পরে আসবেন।"

"কখন?"

"এই তো দোকান খুললুম, অন্য এক সময় আসুন, এখনও ক্যাশে কিছু জমা পড়েনি।"

"অন্য এক সময় মানে কখন?"

অনন্ত নাছোড়বান্দা। যত বিরক্তই হোক সে লেগে থাকবে। নারায়ণ দত্ত অবশ্য ভাড়া ফেলে রাখে না। ভাড়াটেদের ভাড়া দেওয়ার তারিখ খাতা থেকে দেখে সে বুঝে নিয়েছে কার কাছে কবে যেতে হবে।

"পরশু বিকেলে আসুন।"

ভাড়ার বিলবই তার সঙ্গেই আছে। ন্যাশনাল গ্লাস স্টোরের বিলের পিছনে সে তাগিদায় আসার তারিখটা লিখে রাখল। পাশেই হিন্দ মোটর পার্টসের দোকান। মালিক

এক পাঞ্জাবী। এখানেও প্রায় একই কথা, পরের হপ্তায় দেব।'

অঘোর ভবনের ফটকের লাগোয়া একটা পান-সিগারেটের দোকান। দেয়ালে কাঠের পাটা লাগিয়ে ফুটপাথের দিকে দেড় হাত বেরিয়ে থাকা জায়গাটুকুতে বাবু হয়ে বসে, পরিষ্কার ধুতি গেঞ্জি পরা, কপালে সিঁদুর ফোঁটা, পাকানো গোঁফ, টেরিকাটা, হৃষ্টপুষ্ট লোকটির বা দোকানের নামে বিল লিখেছে বলে অনন্তর মনে পড়ল না। খাতায় নাম থাকলে নিশ্চয়ই বিল লেখা হয়েছে! সে তন্নতন্ন করে বিলবইটার প্রত্যেক পাতা দেখল। অঘোর ভবনের দেয়ালেই যখন দোকান, তাহলে অবশ্যই তাদের ভাড়াটে। কিন্তু পান-সিগারেট দোকানের নামে একটিও বিল নেই!

অস্বস্তিভরে সে দোকানের সামনে দাঁড়াল। লোকটাকে শক্তধাতের মনে হচ্ছে। পান সাজছে যন্ত্রের মত হাত চালিয়ে। চূণ, খয়ের, সুপুরি, জর্দা, দশ সেকেণ্ডের মধ্যে পান তৈরী! সার সার নানা ব্র্যাণ্ডের সিগারেট প্যাকেট। বলা মাত্রই আঙুলের ডগা দিয়ে প্যাকেট টেনে নিয়ে সিগারেট বার করে দিচ্ছে।

অনন্ত অপেক্ষা করল খদ্দেরদের বিদায় হওয়ার জন্য। এক সময় লোকটি ভ্রূ তুলে তাকাল, "কি দেবে?"

"আপনার দোকান?"

"হ্যাঁ।"

সন্দিগ্ধ এবং বিস্মিত চোখে তাকে দেখছে। অনন্ত এগিয়ে এসে গলা নামিয়ে বলল, "আপনি ভাড়া দেন?"

"নিশ্চয়।"

"আমি ভাড়া আদায় করতে এসেছি।"

"কি নাম আপনার, কে পাঠিয়েছে?"

"এস্টেট থেকে আসছি, আমার নাম অনন্ত দাস।"

বিল বইটা সে দেখাল। লোকটার কথায় সামান্য বিহারী টান না থাকলে বাঙালিই মনে হত।

"আপনি যে বাড়িওয়ালার লোক তা বুঝব কি করে? বিল তো ছাপাখানা থেকে যে কেউই ছাপিয়ে আনতে পারে।"

অনন্ত ফাঁপরে পড়ল। একটা চিঠি বা ছবিওলা আইডেন্টিটি কার্ড থাকলে ভাল হত। এমন প্রশ্ন যে উঠতে পারে তা একবার ভেবেওছিল। অজয় হালদার বলেছিল: "ও সব লাগবে না, সবাই একবার চিনে গেলে আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।" অনন্ত দ্বিতীয়বার আর বলেনি। নিজেকে চিনিয়ে নিতে না পারাটা হয়তো তাকে অযোগ্যতার পর্যায়ে ফেলে দেবে।

"আমার ভাড়া পরিমলবাবু নিয়ে যেত।"

"তিনি আর নেই।"

"জানি। আমাকে বলে গেছে। এস্টেটের পেট্রল পাম্পে কাজ করছে।"

"তাহলে ম্যানেজারবাবুকে বলব ভাড়ার জন্য আপনাকে চিঠি দিতে।"

"চিঠিমিঠি কেন দেবেন..." লোকটা বিব্রত হয়ে বলল। "আপনাকেই ভাড়া দেব। পরিমলবাবু তো বিলটিল দিত না, আপনিও দেবেন না।"

"সে কি! বিল দেব না?"

খদ্দের এসে পান চাওয়ায় লোকটা ব্যস্ত হল। অনন্ত এইবার বুঝতে পারছে ভাড়াটেদের লিস্টে কেন এর নাম নেই। এস্টেটকে গোপন করে দোকান বসান হয়েছে, ভাড়াটাও গোপন রাখা হয়েছে। পরিমল চাটুজ্জেই একমাত্র লোক আদায়ের দায়িত্বে ছিল। সে যা জমা দিত তাই জমা করা হত। খাতাপত্র সেই লিখত, হিসেবও রাখত। কেউই ভাড়াটে সম্পর্কে খোঁজখবর নিত না। এভাবে কত টাকা যে পরিমল চাটুজ্জে পকেটে পুরেছে কে জানে।

"তিন হাজার টাকা সেলামি দিয়েছি, মাসে সত্তর টাকা ভাড়া। আজ দু' বছর হল দোকান করেছি।"

লোকটা হাসছে। হাসিটা খুব স্বচ্ছ নয়।

"আগের লোক কামিয়েছে, আপনিও কামান। ভাড়ার টাকা তো আমি দেবই। টাকা কে নিচ্ছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। এ বাড়িতে অনেকভাবে টাকা কামাতে পারবেন।"

"অনেক ভাবে?"

"হ্যাঁ অনেকভাবে। আপনাকে পরে বলব।"

"এখনি বলুন না।"

"বাড়ির উঠোনটা তো দেখেছেন, কত রকমের লোহালক্কড়, বস্তা, বাক্স, পেটি পড়ে আছে, ওমনি ওমনি কি আছে? ভাড়া দিচ্ছে। বিলটিলের ধার ধারে না।"

"কারা দিচ্ছে?"

"কাঁচের দোকানের মাল থাকে, মোটর পার্টসের দোকানেরও থাকে, বাইরের প্লাইউড দোকানের, বড় বড় বোর্ড, রাতে রেডিমেড জামাকাপড়ওয়ালার চৌকি বাক্সও থাকে। জলের পাম্প খারাপ বলে, নতুন পাম্প পরিমলবাবু কিনল, পাম্পটা কিন্তু ভালই ছিল, সেটা বিক্রি করে দিল, টাকা কি জমা দিয়েছে? দেখুন আমি সব জানি, বুঝতে পারি। এখানকার দরোয়ান নিতাই ওরই লোক..বাঙালি। একে আগে তাড়ান, চোট্টা আছে। রাতে এসে দেখবেন কত লোক ঘুমোয়, সকালে স্নান করে, পায়খানা সারে, সবার কাছ থেকেই পয়সা নেয় নিতাই। আমি আপনাকে ভাল লোক দিব, আমার ভাইয়ের ছেলে।"

লোকটা এতক্ষণ ঝুঁকে চাপা স্বরে দ্রুত কথা বলছিল। খদ্দের আসতেই সোজা হয়ে বসল। অনন্ত উত্তেজিত বোধ করছে। এতভাবে বাড়িটা থেকে টাকা ওঠে অথচ এক পয়সাও জমা পড়েনি। আজই সে গিয়ে ম্যানেজার অজয়বাবুকে বলবে। রাতে সাধন বিশ্বাসকে তো জানাবেই। প্রথম দিনেই এই সব খবর পেয়ে যাওয়া, তার কল্পনার

অতীত।

"ওকে আসতে বলি?"

"কাকে?"

"আমার ভাইয়ের ছেলেকে।"

"আগে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কথা বলব। লোক রাখা না রাখার মালিক তো আমি নই। এখন আপনার ভাড়াটা দিন।"

"কাল পাবেন, দোকানে তো টাকা রাখি না, ঘর থেকে আনতে হবে। আপনি ম্যানেজারবাবুকে বলুন...এখানে যা চলছে তাতে এস্টেটেরই লোকসান হচ্ছে। ভাল লোক রাখা চাই। আমার ভাইয়ের ছেলেকে রাখলে চোরা কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। আপনাকে সব তো বললুম, এবার আপনি ম্যানেজারবাবুকে বলুন।"

"বলব। আপনার নামটা কি?"

"নন্দকিশোর তেওয়ারি। আর যদি বলেন, আপনারও যাতে দু-চার টাকা আসে তাও ব্যবস্থা করতে পারি।"

"আমি চোর নই।"

"আহ্হা, আমি কি চুরির কথা বলছি। আপনাকে দেখেই বুঝেছি ভালো লোক আছেন। উপরি রোজগার তো ভাল-মন্দ সব মানুষই করে। টাকার কি দরকার নেই? সবার দরকার।"

"আমার দরকার নেই। আমি কাল তাহলে আসছি।"

ফটক দিয়ে ঢুকে ডানদিকে সিমেন্ট বাঁধান বড় চৌকো উঠোন আর সিঁড়ির পাশ দিয়ে ঢাকা লম্বা একটা পথ। নন্দকিশোর যা বলেছিল সেই রকমই, প্রায় গুদামের মত হয়ে আছে জায়গাটা। একধারে স্তূপ হয়ে আছে কাঠের ভাঙ্গা বাক্স। তার পাশে বস্তায় ভরা কাপড়ের ছাঁট, মোটর গাড়ির স্প্রিং, পিনিয়ন, সরবতের ঠেলা গাড়ি, মোবিলের ড্রাম, দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ির পাশে বাণ্ডিল করে রাখা চটের বস্তা।

সে নিতাইকে খুঁজল। একতলায় একটা ঘরে থাকে, এইটুকুমাত্র সে জানে। ওকে সে একবারমাত্র অঘোর এস্টেটে দেখেছে। অজয় হালদার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিল: "দারোয়ান কাম কেয়ারটেকার। বছর দশেক কাজ করছে।" চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। কালো, রোগা, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। নিতাইয়ের বিনীত কৃতার্থ ভঙ্গি তার ভাল লাগেনি।

ঢাকা পথটায় সে উঁকি দিল। পথের শেষে তালা দেওয়া কলঘর, তার পাশে পাইখানা ও পাম্পঘর। বাঁদিকে তিনটে ঘর, বসবাসের জন্য নয়। মাত্র একটি জানালা প্রতি ঘরে, সম্ভবত মালপত্র রাখার জন্যই ঘরগুলো। একটা ঘরের জানালা এবং দরজায় গেরুয়া রঙের পর্দা। অনন্ত এগিয়ে এসে পর্দা সরিয়ে দেখল, দরজায় তালা দেওয়া। এখানেই কি নিতাই থাকে? সে কি জানালা-দরজায় পর্দা টাঙানোর মত লোক?

অনন্ত ফিরে আসার সময় সিঁড়ির কাছে তাকে পাশ কাটিয়ে পথটার দিকে চলে গেল

একজন মহিলা। যাবার সময় কৌতূহলে তার দিকে একবার তাকিয়েছিল। ডান গালে আঁচিল, হাতে ছাতা আর ব্যাগ, ছোটখাট ফর্সা চেহারা। কালো ফ্রেমের চশমা। দ্রুত ছোট পদক্ষেপ, পরণে কালো সরু পাড় সাদা মিলের শাড়ি। তার মনে হল, ইনিই বোধ হয় ঘরটায় থাকেন। ভাড়াটে ? কিন্তু একতলায় দোকান ছাড়া আর তো কোন ভাড়াটে নেই !

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে অনন্ত ঘরটার কাছে ফিরে এল। আলো পাওয়ার জন্য। জানলার পর্দা অল্প সরাল, দরজার পর্দাও। কিন্তু তাতেও ঘরের ভিতরটা আবছা। অনন্ত কিছুই দেখতে পেল না। বাসন নাড়ানোর শব্দ এল।

মহিলা প্লাস্টিকের একটি বালতি হাতে হঠাৎ বেরিয়ে আসতেই অনন্ত এক পা সরে গেল। মহিলা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাউকে খুঁজছেন কি ?"

"হ্যাঁ, মানে আমি ভাড়া তুলতে এসেছি, নতুন, আজই প্রথম। আপনি কি টেনান্ট ?"

"টেনান্ট বললে টেনান্ট, নয়তো নয়।"

"তার মানে !"

"আপনি একটু দাঁড়ান, আমি জলটা ধরেনি। ছাদের ট্যাঙ্কে মাঝে মাঝে জল থাকে না, খুব অসুবিধায় পড়তে হয়. আপনি বরং ঘরে বসুন।"

"না না এই তো বেশ আছি। আবার কেন...।"

কথা না বাড়িয়ে উনি কলঘরের দিকে গেলেন। চাবি দিয়ে কলঘরের তালা খুললেন। দরজা ভেজিয়ে দিলেন ভিতরে ঢুকে। অনন্তের মনে হল, এটাও পরিমল চাটুজ্যের আর একটা রোজগারের ব্যবস্থা। লোকটাকে তার দেখার ইচ্ছা হচ্ছে। শুনেছে বাগুইহাটিতে জমি কিনে একতলা বাড়ি তৈরি করেছে।

জলভরা বালতি নিয়ে উনি ফিরতেই অনন্ত জিজ্ঞাসা করল, "চাবি কি আপনার কাছেই থাকে ?"

"এটা ডুপ্লিকেট। দোকানের ওদের কাছেও একটা করে আছে।"

পর্দা সরিয়ে উনি ঘরে ঢুকে ভিতর থেকেই বললেন, "আপনি ভেতরে এসে বসুন।"

অনন্ত সামান্য দ্বিধা করে ঘরে ঢুকল। ঘরটা বেশ বড়ই। দড়িতে পর্দার কাপড় ঝুলিয়ে ঘরটা দু'ভাগ করা। উনি পর্দার ওধারে গেছেন হয়তো বাইরের কাপড় বদলাতে।

পর্দার এধারে অর্থাৎ দরজার কাছাকাছি খুবই পুরনো একটি কাঠের গোলাকার টেবল আর দুটি হাতলবিহীন চেয়ার। টেবলে কয়েকটি পুরনো বাংলা খবরের কাগজ সযত্নে ভাঁজ করে রাখা। শুধুই তারিখ দেওয়া একটা ক্যালেণ্ডার দেয়ালে। ঘরের কোণে এইমাত্র ছেড়ে রাখা জুতোর পাশে হাওয়াই চটি। ছোট একটা জলচৌকিতে কুঁজো আর কাচের গ্লাস। জানলার কাছে নিচু একটা জালের আলমারি, তার উপরে কেরোসিন স্টোভ। জলের বালতিটা ওখানেই রাখা। আলমারিটাই বোধ হয় ভাঁড়ার এবং

রান্নাঘরের কাজ করে। পর্দার ওধারে কি আছে অনন্ত তা জানে না কিন্তু এধারে এত কম আসবাব এবং সেগুলি এত পরিচ্ছন্ন, গোছানো যে তাই থেকে এর মালিকের মানসিক গঠনটা যেন আঁচ করা যায়...নির্বিরোধী এবং কল্পনাপ্রবণ। অনন্তের মনে হল এই মহিলার সঙ্গে ঘরের চেহারাটার খুবই মিল আছে।

"বসুন। বলুন কি বলছিলেন ?"

একটা চেয়ারে উনি বসলেন অনন্তের মুখোমুখি। পর্দার ওধারে হাঙ্কা একটা ধোঁয়ার শীষ লতিয়ে উঠেছে। ধূপ জ্বালিয়েছেন। শাড়ি বদলে একটা সাদা থান পরেছেন। চশমার কাচ কাপড়ে মুছতে মুছতে হাসি মুখে তাকিয়ে। চোখের কোলে কালো ছোপ। বয়স বোধ হয় চল্লিশের এধার ওধারে।

"আপনি কদ্দিন আছেন।"

"তিন বছর।"

"ভাড়া কত ?"

"সত্তাই, চল্লিশ টাকা।"

"আপনার নাম কিন্তু আমাদের খাতায় নেই।"

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। ভ্রু কুঁচকে সন্দিহান গলায় বললেন, "নাম নেই...কেন ?"

"কাকে ভাড়া দিতেন ?"

"পরিমলবাবুকে, তিনিই তো মালিকের লোক !"

"হ্যাঁ। বিল দিতেন ?"

"নিশ্চয়, দাঁড়ান আপনাকে দেখাই।"

উনি উঠে গেলেন। দড়িতে কড়া লাগানো পর্দাটা সরিয়ে ভিতর মহলে যাবার সময় অনন্ত ওঁর দিকে তাকিয়েছিল। তাই সে সরান পর্দার ফাঁকা জায়গা দিয়ে দেখতে পেল দেয়ালে প্রায় এক হাত চতুষ্কোণ, সাদা ফ্রেমে বাঁধান একটা ফোটো। একটি পুরুষের মুখ, গলা ও কাঁধ দেখা যাচ্ছে। ফোটোর নীচে কাঠের ব্র্যাকেট, সেখানে ধূপদানিতে তিন-চারটি জ্বলন্ত ধূপ।

ধীরে ধীরে অনন্তের ঘাড় থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে চলন্ত পোকার মত একটা বিস্ময় নেমে গেল কোমর পর্যন্ত। বাবা ! কোন সন্দেহ নেই। ডানদিকের রগের কাছে কাটা দাগটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওটা নাকি স্কুলে পড়ার সময় কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের লাঠিতে হয়েছে। বাবা এর বেশি তাদের কিছু বলেনি।

এখানে এমন অকস্মাৎ বাবার ছবি দেখতে পেয়ে অনন্ত প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল। তার বোধ ও যুক্তির শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার মত দশায়। টেবলে রাখা আঙুলগুলো থরথর করছে, গলা শুকিয়ে এল। মাথায় একটা চিন্তাও স্থির থাকছে না।

ইনি তাহলে কে ? বাবার ছবি এত যত্নে টাঙান, ধূপ জ্বালান...কে হন ? মনের মধ্যে হঠাৎ ঝুলসে উঠল বাবাকে লেখা কে এক মিনুর চিঠিটা।

"এই যে, পাঁচ মাস আগের একটা বিল।"

অনন্ত অসাড় হাতটা বাড়িয়ে বিলটা নিল। হুবহু তার কাছে যে বিল রয়েছে সেই রকমই। এস্টেটের স্ট্যাম্পটা আসলই কিন্তু সইটা কেমন জড়ানো, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

মিনতি করের নামে বিল। ডাকনাম মিনু হওয়াই সঙ্গত।

"মিনতি কর আপনার নাম ?"

"হ্যাঁ।"

"পরিমলবাবুর সই ?"

"বলতে পারব না, উনি লিখেই আনতেন, শুধু তারিখটা বসাতেন ভাড়া নেবার সময়।"

ছবিটা কবে তোলা ? সতেজ যুবকের মত দেখাচ্ছে। চাহনিটা জ্বলজ্বলে, তীক্ষ্ণ অথচ হালকা হাসিতে ছাওয়া। বাবার এমন মুখ সে কখনো দেখেনি। ঘন থাক থাক চুল কপাল থেকে পিছনে ওল্টান। চুল উঠে কপালটা চওড়া হয়ে গেছল শেষ দিকে। চোয়ালে চর্বি জমেছিল কিন্তু এই ছবিতে গালদুটো মসৃণ, সমান। বাবার বয়স তখন কত, পঁচিশ-আঠাশ ? ছবিটা কি বিয়ের আগে তোলা ? অনন্ত কখনো তার বাবার এই ছবি দেখেনি।

সে কথা বলছে না। উনি অবাক হয়ে অনন্তর দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালেন। ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ চোখ স্থির হয়ে রইল।

"এটা তো পাঁচ মাস আগের, তারপর আর ভাড়া দেননি ?"

পাংশু হয়ে গেল ওর মুখ। শিশুর মত মাথা নাড়তে লাগলেন।

"চার মাস দেননি, এইটে নিয়ে পাঁচ মাস।"

"হ্যাঁ। আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয়নি, এখনো সম্ভব নয়। অ্যাঞ্জেল কেমিক্যালসে কাজ করতুম, আজ ছ'মাস সেখানে লক আউট চলছে। জানি না অফিস আর কখনো খুলবে কিনা।...আমাকে কি তুলে দেবেন ?"

অনন্তের বড় করুণ লাগল ওর শেষের কথাটি। কিন্তু বাবার সঙ্গে এর কোথায় পরিচয়, কেমন করে পরিচয় ? এই রকম একটা ছবি তাদের সংসারে নেই কেন ? গত ছ'মাসের মধ্যে একবারও কি কেউ বাবার সম্পর্কে কোন কথা বলেছে...অনু, অলু, মা ? সে নিজে ?

প্রশ্নগুলো একসঙ্গে তার মাথাটাকে কামড়ে ধরছে আর যন্ত্রণাটা বুকের দিকে এগোচ্ছে।

সে কি নিজের পরিচয়টা এবার দেবে ? ওঁর সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা আগে জানা দরকার। ধূপ কি রোজ জ্বালেন ? বাবার কোন ছবি সে আজ পর্যন্ত দেখেনি। তাদের ঘরে মানুষের কোন ছবি নেই।

"তুলে দেওয়ার মালিক তো আমি নই। তবে আপনি বেআইনীভাবে রয়েছেন।"

"আমি তো ভাড়া দিয়ে গেছি। ভাড়া বাকি তো পড়তেই পারে।"

"কিন্তু আমাদের খাতায় আপনার নাম নেই, আপনার ভাড়াও জমা পড়েনি। সবই পরিমলবাবু নিজে গাপ্ করেছেন।"

"সে কি ! আমি তাহলে ভাড়াটে নই ? পরিমলবাবু এই রকম লোক তা তো বুঝতে পারিনি ! আমাদের অফিসে ওর ভাই কাজ করেন তার মারফত ওর সঙ্গে পরিচয়। খুব দরকার শুনে ঘরটা আমাকে দিলেন। ওঁকে ছাড়া আর কাউকে চিনিই না।"

অনন্ত মাথা নাড়ল।

"বাইরে পানওলারও একই ব্যাপার।"

"আমাকে আপনারা তাহলে রাস্তায় বার করে দিতে পারেন ?"

"আপনি অত ভাবছেন কেন ? আর কোথাও কি থাকার জায়গা আছে ?"

"আমার কোথাও কেউ নেই।"

আর্তনাদের মত অনন্তের কানে ঠেকল। অবিনাশ কাকা বলেছিল বাবা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে দুবারে সাত হাজার টাকা তুলেছে, সে কি এনারই জন্য ? কিভাবে খরচ হল ?

চিঠিটায় একটা লাইন ছিল : 'গত এক মাসে একবারও এলে না।' এখানে কি বাবা আসত ! কিন্তু মিনতি কর তিন বছর এই ঘরে, তার মানে বাবা মারা যাওয়ার পর এসেছেন। আগে তাহলে কোথায় থাকতেন ?

"আপনার আত্মীয়স্বজন, ছেলেমেয়ে... !"

"নেই।"

"আপনি অবিবাহিতা ?"

প্রশ্নটা করেই শ্বাসবন্ধ করে সে উত্তরের অপেক্ষায় রইল। জিজ্ঞাসা করাটা বোধ হয় গর্হিত হয়ে গেল।

মিনতি করের চাহনিটা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল নিবিয়ে দেওয়া সলতের আগুনের মত। চোখের মণিদুটো গাঢ় হয়ে উঠল। মাথাটা একটু নুয়ে পড়ল।

অনন্ত আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না। উত্তেজনার আধিক্যে সে বলে ফেলল, "ওই ছবিটা কার, আপনার স্বামীর ?"

প্রশ্ন করেই মায়ের মুখটা একবার তার চোখে ভেসে উঠল। বাবার গোপন জীবনের মধ্যে সে ঢুকতে যাচ্ছে। উচিত কি অনুচিত, বুঝতে পারছে না। সে অঘোর এস্টেটের কর্মচারী, ভাড়া আদায় করতে এসেছে। তার সামনে এমন একজন যিনি আইনত ভাড়াটে নন। সেইভাবেই তার আচরণ, কথাবার্তা হওয়া উচিত নয় কি ? কারুর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার তার নেই।

তবে ওঁকে অঘোর এস্টেটের একজন কর্মচারী এমনভাবে ঠকিয়েছে যেটা ধরা ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। দোষটা ওঁর নয়। অনন্ত তার অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বুঝতে পারছে তার তরফ থেকে বলার কিছু নেই।

কিন্তু সে বাবার জীবনেরই একটা অংশ। ওই ছবিটায় তারও এক ধরনের অধিকার

আছে। সুতরাং সে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না কেন ?

"উনি আমার কেউ না অথচ সব।"

মৃদু স্বরের কথাগুলো চন্দনের গন্ধের সঙ্গে ভেসে অনন্তের রোমকূপগুলোয় ধীরে ধীরে থিতিয়ে বসল। অযথা একটা ভার তার শরীরকে ক্লান্ত করতে শুরু করল। সে চুপ করে থাকল।

"জীবনটা এক সময় বড় ছোট মনে হত, সময় কিভাবে যেন হু হু করে চলে যেত।"

মিনতি কর আবার মুখ ফিরিয়ে ছবিটার দিকে চেয়ে রইলেন। অনন্ত, ওঁর ডান চোখের কিনারা বাষ্পে চকচক করছে, দেখল।

"পাশের বাড়িতে ওঁরা থাকতেন, ছোট থেকে আলাপ। আমাদের বিয়ে হবে ঠিক ছিল, হয়নি।"

"কেন ?"

"আমার নামে অনেক কিছু রটনা করেছিল ওর ভাই, উনি তা বিশ্বাস করেছিলেন। তখন আমার উপর রেগে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলেন।...পরে অবশ্য ভুল বুঝতে পারেন।"

"আপনি বিয়ে করেননি ?"

মিনতি কর ধীরে মাথা নাড়লেন।

"মেয়েরা একজনকেই ভালবাসে।"

"ওর বৌকে দেখেছেন ?"

"না।"

অনন্ত ইতস্তত করে বলল, "ওর পরিবার সম্পর্কে কিছু জানেন না ?"

"খুব বেশি নয়। দুটি ছেলে দুটি মেয়ে জানি, তারা স্কুলে পড়ে। বড়টি হয়তো এখন কলেজে।"

"তারা কি আপনার কথা জানে ?"

"বোধ হয় না।"

মিনতি কর উঠে ছবিটার কাছে গেলেন। দু'তিনটে ধূপ নিবে গেছে, দেশলাই জ্বেলে ধরালেন।

"এখন ধূপগুলো যা হয়েছে, একটা গোটা দেশলাই খরচ হয়ে যায়।"

"রোজ জ্বালেন ?"

"প্রতি শুক্রবার জ্বালি, এই বারেই উনি মারা গেছেন।"

বাবার মৃত্যুর তারিখটা তার মনে আছে কিন্তু বার কি ছিল মনে নেই। তারিখটা এলে বাবাকে মনে পড়ে। ছড়ানো এলোমেলো কিছু ছবি, কিছু ভঙ্গি,... থালায় ভাত মাখার, জুতোয় ফিতে বাঁধার, রাস্তা দিয়ে হাঁটার। কিছু কথার...'পায়ের আঙুলে ময়লা কেন ?' ; 'পেন্সিলটা দু'আধখানা করে দুজনে নাও' ; 'রান্নাঘরটা এত নোংরা থাকে কেন ?' সেদিন অনাদের কিভাবে বাবাকে মনে পড়ে তা জানে না, কেউ বাবার প্রসঙ্গ তোলে না।

তাদের জীবনে আর যেন মানুষটির কোন দরকার নেই। মা'ও কখনো কিছু বলে না।

অথচ এই ঘরে বাবাকে মনে রাখা হয়েছে। কিছু একটা দিয়েছেন যা মিনতি করের জীবনে গভীরভাবে শিকড় ছড়িয়েছে। কি সেটা ? ভালবাসা ! বাবাও নিশ্চয় ওঁর কাছ থেকে পেয়েছেন। ব্যাপারটা সে ঠিকমত বুঝতে পারছে না। আর কিছু জিজ্ঞাসা করাটাও উচিত হবে না।

"চাকরি নেই তাহলে ভাড়া দেবেন কি করে, এখন চালাচ্ছেন কিভাবে ?"

"টিউশানি করছি, সকাল বিকেল রাত, খাওয়াটা চলে যায়।"

"কিন্তু ভাড়া ?"

"আমি জানি না।...কিভাবে যে দোব ! উনি থাকলে আজ এসব চিন্তা করতে হোত না।"

অনন্ত উঠে দাঁড়াল।

"যাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ। আমাকে আর আপনি করে বলবেন না, লজ্জা পাব।"

"আমাকে তুলে দেওয়া হবে কি ? আমি তো জানতাম না পরিমলবাবু এভাবে ঠকাবেন !"

"দেখি কি করা যায়।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নিতাইকে সে খুঁজে পেল না। নন্দকিশোর তাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, "দেখবেন বাবু, আমার ভাইয়ের ছেলের কথাটা মনে রাখবেন।"

অঘোর এস্টেটে ফিরে এসে অনন্তকে অপেক্ষা করতে হল। ম্যানেজার অজয় হালদার ব্লাডপ্রেশারের রুগী, দুপুরে ঘণ্টা দুই ঘুমোন। দেয়ালে ঠেশ দিয়ে পা ছড়িয়ে অনন্ত জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় কাটাল। তখন সে গোপন একটা ব্যাপার জেনে ফেলার ধাক্কা সামলে নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে যায়। সে ঠিক করে ফেলে মিনতি করের কথা বাড়িতে কাউকে বলবে না।

তার আজকের অভিজ্ঞতার কথা সে অজয় হালদারকে বলল। তিনি চোখের ইশারায় দোতলার বৈঠকখানাকে ইঙ্গিত করে বললেন, "ওনাকে জানাতে হবে। নিতাইকে সরিয়ে অন্য কাউকে রাখা না রাখার মালিক উনি। তবে এ-রকম যে চলছে সেটা আঁচ করে ঠারে ঠোরে ওনাকে বলেওছি কয়েকবার। যাই হোক পরিমলকে শেষ পর্যন্ত অ্যাটর্নিবাবুর পরামর্শে সরান হল। এটা এমনি এক চাকরি প্রলোভন পদে পদে। সৎ মানুষকে অসৎ করে দেয়, দশ বছরে তিনজনকে সরান হল। তুমি যে সব কথা খুলে জানালে এটাই দরকার। সৎ থাকবে তাহলে জীবনে উন্নতি করতে পারবে।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে অনন্তের বুকের মধ্যে কাঁপন লাগল। সে সব কথাই বলেছে শুধু একটি ঘরের কথা বলেনি যেখানে বাস করে এমন একজন যে তার বাবাকে ভালবাসত, আজও ভালবাসে।

সে বিমর্ষ হয়ে বাড়ি ফিরল। জেনেশুনে এই প্রথম সে অসাধু হল। কেউ জানতে

পারলে তাকে আর ভালো বলবে না। কাউকে বোঝাতেও পারবে না কেন সে মিনতি কর নামটা খাতাপত্রের বাইরে রাখতে চায়।

রাত্রে সাধন বিশ্বাস-কে সে এন্টালির বাড়ির কথা বলল। তিনি যে ঠিক লোককেই কাজটার জন্য সুপারিশ করেছেন, লোক চেনার সেই বিরল ক্ষমতার গর্ব তার চোখেমুখে প্রতিফলিত হল। এবারও একতলার ঘরের কথাটা সে বলতে পারল না।

রাতে খাওয়ার পর হঠাৎই সে মাকে বলল, "বাবার কোন ছবি নেই?"

"আছে তো।"

"কই দেখি?"

শীলা ট্রাঙ্ক খুলে কাপড় ঘাঁটাঘাটি করে ছবি বার করে আনল।

অনন্ত অবাক হয়ে দেখল সেই ছবিটাই যা আজ সকালে সে দেখেছে, তবে এটা আকারে অনেক ছোট পোস্টকার্ড মাপের।

"কবেকার তোলা?"

"বিয়ের পর।"

"রেখে দাও।"

সে দ্বিতীয়বার আর ছবিটার দিকে তাকায়নি।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে সে মনের মধ্যে একটা খচখচানি অনুভব করেছিল। সে তখন জানত না আজীবন এটা তাকে অস্বস্তি দেবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

॥ ৭ ॥

পরের মাসেই অনন্তের চাকরি পাকা হয়ে গেল। যে উদ্বেগে সে এবং তাদের সংসার কাঁটা হয়ে থাকত, সেটা আর নেই। এখন তারা নিরাপদ, এই বোধ তাদের স্বাচ্ছন্দ দিয়েছে পরিচিতদের সঙ্গে মেলামেশায়।

অজয় হালদারের অবসর নেবার সময় হয়ে এসেছে, ব্লাডপ্রেশারের জন্য প্রায়ই কামাই করে। বাবার আমলের লোক, সমীরেন্দ্র তাই ওকে বসিয়েই মাইনে দেন। ওর কাজগুলো একে একে অনন্তের উপর এসে পড়তে লাগল। এতে সে খুশিই। অবসর সময় কিভাবে কাটাবে সেই সমস্যা অনেকটা মিটিয়ে দেয় বাড়তি কাজগুলো।

কর্মস্থল থেকে সে সোজা বাড়ি ফিরে আসে। সে সিনেমা দেখে না, আড্ডাও দেয় না যেহেতু তার বন্ধু নেই। মায়ের সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্তা ছাড়া আর তার অবসর কাটাবার কিছু নেই।

ধুতি-শার্টের মতই অঘোর এস্টেট থেকে বাড়ি প্রায় দেড়মাইল রাস্তা হেঁটে যাতায়াতের অভ্যাসটা সে ছাড়েনি।

আহিরিটোলা বাড়ির ভাড়া আদায়ে বা কর্পোরেশন অফিসে ট্যাক্স, ইলেকট্রিক আপিসে বিল জমা দিতেও সে হেঁটে যায়। হাঁটা তার কাছে নেশার মত।

"শরীর ফিট্ থাকে।"

"তাই বলে রোজ রোজ এত হাঁটবি? এখন ত আর ট্রাম বাসের খরচ বাঁচাবার মত অবস্থা নয়।"

"না হলেই বা, খরচ না করলে যখন চলে তখন করব কেন, এতো আর চাল নুন তেল নয়? হিসেব করে দেখেছি হাঁটলে আঠারো থেকে কুড়ি টাকার মত সেভ হয়, বাড়িভাড়ার প্রায় ওয়ান-ফোরথ্।"

শীলা দালানে রুটি সেঁকছিল। অনন্ত খালিগায়ে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে। তার পাশে থালায় গরম রুটি আর বেগুনভাজা।

"সেদিন ওপরে গেছলুম, বড়গিন্নি এ কথা সে কথার পর বলল, এবার কিছু বাড়াও, অনেকদিন ধরেই তো সত্তর রয়েছে...গোটা একতলা, এখন এরভাড়া কমকরে আড়াইশো, সেলামিও হাজার চারেক হবে। অনন্ত তো রোজগার করছে..."

"ভাড়া বাড়াও বললেই যেন বাড়াতে হবে! আমাদের আহিরিটোলার বাড়িতে তিনখানা ঘর, ছাদ, আলাদা কল-পায়খানা নিয়ে রয়েছে, ভাড়া দেয় কত জান? উনচল্লিশ টাকা বারোআনা। রেন্টকন্ট্রোলে এই মাসেই সাধনবাবু ভাড়া বাড়ানোর জন্য মামলা তুলবেন। এন্টালির বাড়িতে এক একটা ফ্ল্যাট, কেউ দেয় পঁয়তাল্লিশ, কেউ দেয় পঞ্চান্ন, সব পঞ্চাশ-ষাট বছরের ভাড়াটে।... উঠে যাক্, এখুনি ছ'শো টাকা'র ভাড়া হয়ে যাবে। এদের বলে দিও একআধলাও বাড়াব না।"

অনন্ত ক্রমশই হিসেবী হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রখর হয়েছে বাস্তববুদ্ধি। সে এখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছে অনুর বিয়ের কথা। অনু বড় হয়েছে। ওর শরীরের দিকে

আগের মত আর অসঙ্কোচে তাকান যায় না।

কয়েকদিন ধরেই তার চোখে পড়ছে উঠতি বয়সী কিছু ছেলে, তাদের জানলার উল্টোদিকে উৎপলদের রকে বসে একটু বেশি জোরে কথা বলছে, নিজেদের পরাক্রম সম্পর্কে জোরালো দাবি রাখছে, ঘনঘন তাদের জানলার দিকে তাকায়। ওদের বেশিরভাগই তার থেকে মাত্র তিন-চার বছরের ছোট কিন্তু তাকে দেখলেই গলা নামিয়ে কথা বলে। এটা তাকে অদ্ভুতভাবে তৃপ্ত করে। সে অভিভাবক, সংসারের কর্তা এবং মানী। বাবা বেঁচে থাকলে এমনভাবেই লোকে তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করত! অথচ তখন তার বয়স পঁচিশও নয়।

খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন থেকে সে অনুর জন্য সম্বন্ধ খুঁজতে শুরু করে। তিন চার জায়গায় চিঠিও দেয়। উত্তরও আসে।

"সবাই টাকা চায়।"

"এইতো আঠারোয় পড়ল আর দুটো বছর থাক না।"

"না না, ছোটতেই বিয়ে দেওয়া ভাল। তুমি বোঝ না, অল্পবয়সী কাঁচা মন সহজে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারে তাতে সুখীই হয়। আগেকার দিনে সাত-আট বছরেই বিয়ে দেওয়া হতো, খুব ভাল নিয়ম ছিল।"

"যা ভাল বুঝিস কর। গয়নাগুলো থাকলে ভাবনা ছিল না...দু-চার ভরি তো দিতেই হবে, একেবারে খালি গলা-হাতে কি মেয়ে দেওয়া যায়!"

"ব্যাঙ্কে তো হাজার ছয়েক রয়েছে এখনো, তাই থেকে..."

"অনুর জন্য লাগবে না?"

"অর্ধেক টাকা ওর জন্য থাকবে।"

"বিয়ের খরচ তো আছে...কিছু কেনাকাটা, লোক খাওয়ান, নমস্কারী, ফুলশয্যার তত্ত্ব, দানের বাসন নমোনমো করে দিলেও তো হাজার দু-তিন, তার ওপর গয়না, অর্ধেক টাকায় এত সব হবে?"

অনন্ত চুপ করে থাকে। একটা প্রবল বিরক্তির মধ্যে তাকে হাত পা বেঁধে যেন জোর করে শুইয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাত-পা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেই বাঁধনগুলোয় টনটন করে ওঠে। এ সব দায় বাবার।

কিন্তু এখন সে বাবার জায়গায়, সে বড় ছেলে। অনেক টাকার দায় তার ঘাড়ে, অনেক বছর এটা থাকবে। তাকে টাকা রোজগার করে যেতে হবে শুধু এদের জন্য। অমর থাকলে সাহায্য করত কি?

এন্টালি থেকে মৌলালির দিকে হেঁটে যাবার সময় দু'তিনদিন সে একটা চায়ের দোকানে সকালে অমরকে দেখেছিল খবরের কাগজ পড়ছে। সামনের প্লেটে টোস্ট। পরনে লুঙ্গি আর হলুদ পাঞ্জাবি। কাছাকাছিই কোথাও থাকে। দেখা করে কথা বলতে ইচ্ছে করলেও সে জড়তা কাটাতে পারেনি। কি ব্যবহার করবে?

অবশেষে দোকানটার সামনেই একদিন সকালে তারা মুখোমুখি হয়ে গেছল। ন'টার

মধ্যে সেদিন এক ভাড়াটের সঙ্গে দেখা করার কথা। অনন্ত ব্যস্ত হয়ে হাঁটছিল, অমরকে সে দেখতে পায়নি।

"এদিকে কোথায় যাও?"

অনন্ত চমকে উঠেছিল। অমরের দিকে প্রথমে সে অবিশ্বাসীর মত তাকিয়ে ছিল। ডানহাতটা ওর কাঁধে রেখে বলেছিল, "তুইতো বেশ মোটা হয়েছিস।"

অমরের ভ্রূটা কুঁচকে উঠল। কথাটায় আমল না দিয়ে বলল, "বাড়ির সবাই ভাল আছে?"

"হ্যাঁ, মা তোর কথা বলে।"

"অ।"

ওদের দু'পাশ দিয়ে মানুষ চলাচল করছে। ফুটপাথের মাঝখানে পথজুড়ে থাকার জন্য কেউ কেউ বিরক্তি ভরে তাকিয়ে গেল।

"চা খাবে...এসো তাহলে।"

অনুরোধ নয়, প্রশ্ন নয় যেন নির্দেশ। উত্তরের জন্য পরোয়া না করে অমর চায়ের দোকানের দিকে এগোল। ওর সঙ্গে অনন্তও ঢুকল। মুখোমুখি বসল। জীবনে এই দ্বিতীয়বার সে রেস্টুরেন্টে বসল। প্রথমবার গৌরীর সঙ্গে। ছোট্ট দোকান, চারটে মাত্র টেবল। দরজাবিহীন রান্নাঘর থেকে ডিম আর সেঁকারুটির গন্ধ আসছে।

"ওমলেট খাবে?...অ্যাই এদিকে আয়।"

যতক্ষণ না ওমলেট এবং মাখন লাগান টোস্ট এল, অমর খবরের কাগজের পাতা উল্টে দ্রুত উপর-নীচের হেডিংগুলোয় চোখ বোলাল। দু'তিনবার ঝুঁকে পড়ল।

ততক্ষণ অনন্ত ওকে দেখছিল। মসৃণভাবে কামানো গালদুটো ভরন্ত। গায়ের রঙ একটু তামাটে হয়েছে। পাঞ্জাবির বোতাম খোলা, বুকের লোম ঘন, দু হাতেও রোম, বাঁহাতে কালো ডায়ালের ঘড়ি। চুল এলোমেলো, কিছুটা যেন লম্বাও হয়েছে। গলার স্বর আগের থেকে ভারী। অমর একটা পুরুষ মানুষ হয়ে উঠেছে। ওকে দেখে অনন্তের ভাল লাগল।

কাগজ নামিয়ে অমর চায়ে চুমুক দিয়ে একটা টোস্ট তুলে নিল।

"সবাই তাহলে ভাল আছে।"

"মা তোর কথা প্রায়ই বলে, গিয়ে দেখা করলেই তো পারিস।"

অমর কাগজ পড়ায় মন দিল। টোস্টে কামড় দিয়ে চিবোতেই মড়মড় শব্দে অপ্রতিভ হয়ে অনন্ত চিবোন বন্ধ রেখে টুকরোটা মুখের মধ্যে রেখে দিল ভেজাবার জন্য। অমর তার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে যাচ্ছে। কিছুই ভোলেনি তাহলে।

"তুই এখন কি কচ্ছিস, থাকিস কোথায়?"

"একটা ফার্মে আছি, রাত্তিরে পড়ি।"

"বি এ-টা পাশ করেছিস?"

"হ্যাঁ। তুমি কি এখনো বই বাঁধানোর কাজে আছ?"

"না অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি। এই কাজটা... ।"

অনন্ত থেমে গেল। ওকে বলা যাবে না। অমর জিজ্ঞাসুচোখে তাকিয়ে।

"...বছর চারেক করছি। একটা এস্টেটে, এখন আর জমিদারী নেই, ওদের কলকাতার বাড়িগুলোর দেখাশোনা ভাড়া আদায় এই সব করি।"

"অনু-অলুর কোন ক্লাস হলো, পড়ছে ওরা ?"

"অনু ছেড়ে দিয়েছে পড়া, অলুর এবার প্রি-ইউ।"

"ছাড়ল কেন, পড়া কি ছাড়তে আছে। এবার তাহলে বিয়ে দিয়ে দাও।"

নিজের বোন নয়, যেন দূরসম্পর্কের কোন আত্মীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে অমর বলল। অনন্তের ভিতরটা ক্রমশই বসে যাচ্ছিল। ফিকে হেসে ওমলেটের শেষ টুকরোটা চামচেয় তোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, "তাই ভাবছি। টাকা পয়সা তো নেই হাতে.. ।"

অনন্তের আশা জাগল, অমর এবার বলবে সে সাহায্য করবে। কিন্তু তার বদলে সে ওমলেটের টুকরোটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, "ওভাবে উঠবে না, হাতদিয়ে তুলে নাও।"

অপ্রতিভ হয়ে অনন্ত তাই করল। অমর টাকা দিয়ে সাহায্য করবে না এটা সে বুঝে গেছে। কিংবা হয়তো চাইছে হাতজোড় করে দাদা তার কাছে টাকা চাক।

কিন্তু সে চাইবে না। কটা বছর একাই সংসার চালিয়ে গেল, একাই সে বোনেদের বিয়ে দেবে। যেমন ভাগ্য করে এসেছে তেমন পাত্রই পাবে।

"উঠব এবার।"

অমর ইশারায় ছেলেটাকে ডেকে বুকপকেট থেকে পাঁচ টাকার নোট বার করে দিল।

"তুই তাহলে আর আসবি না।"

"না।"

"খোঁজখবরও করবি না ?"

"এইত খোঁজ নিলুম, এইভাবেই নেব। ...দূরে থাকাই তো ভাল।"

"তুই কি আমার ওপর রেগে আছিস এখনো ?"

অমর হাসল। স্বচ্ছ উদার । তাতে একছিটেও মালিন্য নেই।

"একদমই না। হ্যাঁ, তখন রেগে ছিলুম তো বটেই। এখন বুঝতে পারছি ভালই করেছি। সবাই মিলে ওভাবে একসঙ্গে, কোনক্রমে আধপেটা খেয়ে বেঁচেবর্তে শুধু দিনকাটিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হতো না। জড়াজড়ি করে এখন আর কিছু করা যায় না। বড়জোর ভেসে থাকা যায় কিন্তু সাঁতার কাটা যায় না।"

"সবাইকে দেখা, ভরণপোষণ...দায়িত্ব আছে সেটা তো পালন করা উচিত বিশেষ করে যাদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। নয়তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে হবে।...মা দাসেদের বাড়ি রাঁধুনির কাজ নেবে বলেছিল আমি নিতে দিইনি...না খেয়ে থাকব সেও ভাল তবু মানসম্মান খোয়াব না।"

অনন্ত জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে রইল। অমরের মুখে বিরক্তিটা প্রকট হয়ে উঠেছে। খুচরো পয়সাগুলো পকেটে রেখে বাঁহাতের তালুতে মৌরী তুলে নিল।

"মানসম্মান বাঁচিয়ে রেখে কি পেয়েছ ? চার বছর আগে যা ছিলে এখনো তো তাই আছ...ভবিষ্যতেও তাই থাকবে...লোকে বলবে তোমরা মানী, সৎ ভাল...তাই দিয়ে কি অনুর বিয়ে দেওয়া যাবে ?"

"সেটা আলাদা কথা, যা চলে আসছে, যা নিয়ম সেইভাবেই বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্মান একটা আলাদা ব্যাপার।"

"কিসে আলাদা ?"

অনন্ত এই মুহূর্তে কোন জবাব খুঁজে পেল না। সে উঠে দাঁড়াল।

"তুই তাহলে আমাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবি না ?"

"রাখারাখির কি আছে। তোমাদের কি কোন অসুবিধা হয়েছে আমি না থাকায় ?

"না।"

অস্বাভাবিক জোরদিয়ে সে 'না' বলল। অমরের যে আদৌ কোন গুরুত্ব নেই তাদের সংসারে এটাই সে বোঝাতে চাইল।

"তাহলে ? কি দরকার সম্পর্কের ডালপালা ছড়িয়ে ?"

"তাতে সাঁতার কাটায় সুবিধা হয়।"

"ঠিক।"

অমরের সঙ্গে এরপরও কয়েকবার দেখা হয়েছে রাস্তায়, এই চায়ের দোকানের সামনে। 'ভাল আছিস ?' 'বাড়ির সবাই ভাল ?' 'মা তোর কথা বলছিল, দেখতে চায়।' 'যাব একদিন।' এইভাবেই হাঁটা থামিয়ে তারা কথা বলেছে। অমর কোথায় থাকে, কোথায় কাজ করে কিছুই বলেনি, অনন্তও জানতে চায়নি। প্রথমদিন দেখা হওয়ার কথাটা সে মা'কে বলেছিল, তারপর আর বলেনি। মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অমর সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছিল তার কাছে।

অনুর বিয়ের জন্য অর্থ ও পাত্র যোগাড় করার ভাবনা মাঝে মাঝেই তাকে বিব্রত করত। মাঝে মাঝে মনে হতো অমর ঠিকই বলেছে, জড়াজড়ি করে সাঁতার কাটা যায় না। কিভাবে সাঁতার কাটতে হয় সেটাও শেখেনি। অমর বেরিয়ে গিয়ে শিখেছে, হয়তো পাড়ে উঠতে পারবে।

বিজ্ঞাপন দেখে নিয়মিত চিঠি দিয়ে যাচ্ছিল অনন্ত। কটক থেকে একটি জবাব তাকে আশান্বিত করল। মাকে চিঠিটা দেখাল। ছোট চিঠি, পাত্রপক্ষ একপয়সাও নগদ নেবে না, একরতি সোনাও চায় না। মেয়ে পছন্দ হলে তারাই বিয়ের খরচ দিয়ে মেয়ে নিয়ে যাবে।

শীলা অবাক হয়ে বলল, "শুনেছি এ-রকম অনেক বিয়ে হয়েছে, বরপক্ষই খরচ দিয়ে মেয়ে নিয়ে গেছে। সে সব পরমাসুন্দরী মেয়ে...অনু তো দেখতে পাঁচপাঁচি !"

"বলি না মেয়ে দেখে যেতে।"

"অতদূরে, খোঁজখবর নেওয়াও তো সোজা নয়। কেমন ঘর, কেমন লোক, ঠগ কিনা কিছুই তো জানি না। ঠাকুরপোকে বল্ না একবার। ওর তো চেনাশোনা কেউ কটকে থাকতে পারে, খোঁজ খবর নিয়ে জানাবে।"

অবিনাশের চেনালোক ছিল ভুবনেশ্বরে। সে প্রায় রোজই কটকে যায় ব্যবসা সূত্রে। তাকে দিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেল; তিনপুরুষ তারা কটকের বাসিন্দা, সম্পন্ন একান্নবর্তী বিরাট পরিবার। দুটি দোকান আছে গহনার। পাত্রের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, বিয়ে হয়েছিল, বৌ মারা গেছে একটি এক বছরের ছেলে আছে। পাত্র ক্লাস সেভেন-এইট পর্যন্ত পড়েছে।

ওরা তিনজন বিভ্রান্ত বিষণ্ণ হয়ে সন্ধ্যায় দালানে বসেছিল। অবিনাশকে লক্ষ্য করে অনন্ত বলে, "কাকা কি করব বলুন? পরে সবাই আমাকে বলবে, হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে দাদা জলে ফেলে দিল, তা হতে দেব না।"

"এমন ঘর, জল ভাবছিস কেন?"

"বয়সের পার্থক্যটা? অনুর প্রায় দ্বিগুণ!"

"এমন পার্থক্যে কি বিয়ে হয় না? আমার মা আর বাবার মধ্যে পার্থক্য তো একুশ বছরের, কোন অসুবিধা হয়নি...বাহান্ন বছর দিব্যি কাটিয়ে গেছে একসঙ্গে।"

"সে আমলে ওসব হতো এখন কি আর হয়?"

শীলা অস্ফুটে বলল, "গিয়েই ছেলে ধরতে হবে। লেখাপড়ার কথা নয় ধরছি না, পুরুষ মানুষের রোজগারই আসল গুণ।"

অনন্ত বুঝতে পারছে না সে রাজী হবে কি হবে না। শীলার খুঁতখুতনি বিপত্নীক হওয়ার জন্য। অবিনাশের মত আছে।

"আমার মনে হয় অনুকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত...ওর মতামতটাই আসল। ও যদি রাজী থাকে তাহলেই আমরা এগোব।"

অনু ঘরে ছিল। সব কথাই তার কানে গেছে। অনন্তর কথাগুলো শেষ হওয়ার কয়েক সেকেণ্ড পরই ঘর থেকে তার গলা শোনা গেল।

"আমার অমত নেই, তোমরা যেখানে বিয়ে দেবে সেখানেই বিয়ে করব।"

ওরা স্বস্তিবোধ করেছিল। কিন্তু অনন্তের বুকের মধ্যে শুরু হয়ে যায় নতুন একটা খচখচানি। সে মুখ নামিয়ে বসে থাকে।

তখন অবিনাশ মৃদুকণ্ঠে বলেন, "যার যেখানে অন্ন রাঁধা সেখানেই পাত পাততে হবে।"

এক মাসের মধ্যেই অনুর বিয়ে হয়ে গেল। পাত্রের দাদা ও সম্পর্কিত মামা এসে মেয়ে দেখে পছন্দ করে যায়। অনু বলেছিল, তার কোন বন্ধুকে সে নিমন্ত্রণ করবে না। প্রায় নিঃসাড়েই বিয়ে হল। সদরে বাড়তি একটি বালব ছাড়া বিয়েবাড়ির কোন চিহ্ন ছিল না। বরের সঙ্গে এসেছিল চার জন। উঠোনে উনুন পেতে রান্না হয়, খাওয়া হয় দালানে। পাড়ায় কাউকেই তারা বলেনি, শুধু সাধন বিশ্বাস আর তার ছেলে উৎপলকে

নিমন্ত্রণ করেছিল। তিনি আসেননি শরীর ভাল না থাকায়, উৎপল এসে একটা তাঁতের শাড়ি দিয়ে গেছে। দোতলার জ্যাঠামশাই বাদে আর সবাই খেয়ে গেছে। দু-তিনজন কাঙ্গালি সদরের সামনে অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে চলে যায়।

পরদিন বর-বৌ বাড়ি থেকেই হাওড়া স্টেশনে যায়। ওদের ট্রেনে তুলে দিতে সঙ্গে গেছল অনন্ত। অনু ট্যাক্সিতে ওঠার সময় কাঁদেনি। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে কেঁদে উঠবে এমন একটা ব্যাপারের জন্য সে তৈরী ছিল। ট্রেন ছেড়ে দিল। অনন্ত দেখল হাজার বছরের পুরনো কাঠের মত শুকনো মুখ নিয়ে তার বোন একদৃষ্টে সামনে তাকিয়ে বসে। মুখটাকে চিরকালের মত অনন্তের বুকে খোদাই করে দিয়ে ট্রেনটা চলে গেল।

॥ ৮ ॥

অনন্ত ঠিক করেছিল অলুর বিয়ে এমনভাবে দেবে যাতে ওর মনে কোন খেদ না থাকে।

বি এ পাশ করার দু'বছর পর অলু ফুড কর্পোরেশনে চাকরি পায়। নিজের চেষ্টাতেই যোগাড় করেছে। অনন্ত শুনে থ হয়ে গেছিল। তাদের বাড়ির মেয়ে চাকরি করবে দশটা-পাঁচটা! বিস্ময়টা ক্রমশ ভয়ে রূপান্তরিত হয়ে তাকে কিছুদিন নানান অশুভ ভাবনায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। প্রায়ই তার মনে হত, অলু বাবার মত বাস চাপা পড়ে মরে যাবে। এই পরিবারের মধ্যে অলু একটু আলাদা ধরনের। অমরের সঙ্গে ওর মিল আছে। কলেজে পড়ার সময় কিছু ছেলেমেয়ে ওর সঙ্গে দুপুরে বা বিকেলে আসত। বাড়ি ফিরে অনন্ত সে খবর পেত শীলার কাছে।

"অলুর বন্ধুরা বেশ মিশুকে। মুড়ি খেতে চাইল, আমি বললুম দোকানে যাবার লোক নেই, ওদেরই একজন মুড়ি, বেগুনি কিনে আনল। চা করে দিলুম। ছেলেগুলো বেশ।"

"ছেলে?"

"ওর সঙ্গেই পড়ে।"

অলু কলেজ ইউনিয়নের সহ-সম্পাদিকা হয়েছিল। অনেকদিনই সে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরত। অনন্তের সেটা ভাল লাগত না।

"ওকে বলে দিও বিকেল থাকতে থাকতেই যেন বাড়িতে ঢোকে। এ বাড়ির মেয়েরা সূর্য ডুবলে বাড়ির বাইরে থাকে না।"

"বিকেলে টিউশনিতে যায়, হয়তো কোন কারণে দেরী হয়েছে।"

একদিন শীলা একটি পাতলা পত্রিকা অনন্তকে দেখাল, "অলু কেমন পদ্য লিখেছে দ্যাখ।"

অনন্ত অবাক হয়ে পত্রিকার পাতাটার দিকে তাকিয়ে থেকেছিল। ছাপার অক্ষরে তাদের কারুর নাম সে জীবনে এই দ্বিতীয়বার দেখল। বাবার বাসচাপা যাওয়ার খবরটার

সঙ্গে 'শক্তিপদ দাস' নামটা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল।

ষোল লাইনের পদ্যটা তিন-চারবার সে পড়ে। একদমই মাথামুণ্ডু বুঝতে পারেনি। কিন্তু 'স্তন' আর 'চুম্বন' শব্দদুটি তাকে রীতিমত ভয় পাইয়ে দেয়। অলুর হাত দিয়ে এই সব নোংরা জিনিস বেরোয় কি করে? একটা মেয়ে! তাদের বাড়ির মেয়ে এই সব অসভ্য চিন্তা করছে আর পাঁচজনকে তা জানাচ্ছে, লোকে কি ভাববে! তারই বোন, তার সম্পর্কে কি ধারণা হবে? পাড়ার কেউ পড়েছে কিনা কে জানে।

অলুর পদ্যটা কয়েকদিনের জন্য তাকে সন্ত্রস্ত রেখেছিল। সে আবার ভয় পায় যখন শীলা বলল, "অলু দু'দিনের জন্য বন্ধুদের সঙ্গে দীঘায় বেড়াতে যাবে।"

"কি দরকার যাবার?"

"মানুষ বেড়াতে যায় না? এইতো ওপরের ওরা পুরি-টুরি ঘুরে এল।"

"ঘুরুকগে, পয়সা আছে তাই গেছে।" "তোরও তো পয়সা আছে, সেদিন তো বললি এখন সাড়ে ছ'শো টাকা মাইনে। আমায় নিয়ে চল না, কাশীটা একবার দেখে আসি।"

"শুনতেই ওই সাড়ে ছশো। হাতে আর একটু জমুক। জিনিসপত্রের দাম কত বেড়েছে জান? একজোড়া কাঁচকলা চল্লিশ পয়সা, শুনেছ কখনো?"

অলু দীঘা ঘুরে এল। তাদের বাড়ির মেয়ে দুটোদিন বাইরে কাটাচ্ছে এটা, সে ভাবতেই পারে না। অলু যখন তখন বাড়ি থেকে বেরোয়, ফেরারও ঠিক নেই, এটাও সে মানতে পারে না। সে জন্য মার কাছে বিরক্তি প্রকাশ করে, রাগও। কিন্তু অলু তা গ্রাহ্য করে না।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে অলু শীলার হাতে দুশো টাকা দেয়। অনন্ত তখন ঘরে। ওদের কথা তার কানে যাচ্ছিল।

"আমাকে দিচ্ছিস কেন, দাদার হাতে দে।"

"তুমিই দাও।"

"আমি না, তুই দিলেই ভাল দেখায়। সংসারের সব খরচ-খরচা তো ওই করে।"

অলুর মুখটা খুশিতে, লজ্জায় আর উত্তেজনায় টসটস করছিল। দেখতে সুশ্রীই, আলগা চটক সারা অবয়বে। কথাবার্তায় চোখা, অনুর মত কুনো ভোঁতা নয়। এই বোনটিকে নিয়ে অনন্তর যত দুর্ভাবনা ততই নিশ্চিন্তি।

"দাদা।"

অলুর বাড়ানো হাতে কড়কড়ে দুটো একশো টাকার নোট। অনন্ত ভেবেছিল পুরো মাইনেটাই তার হাতে দেবে। তাইতো উচিত। এতকাল যেমন টাকা চেয়ে নিয়েছে, সেইভাবেই চাইবে। অবশ্য টিউশনি শুরু করার পর অলু আর টাকা চায়নি।

"আমায় দিচ্ছিস কেন, জমা, ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোল্।"

"অ্যাকাউন্ট আছে, এটা সংসার খরচের জন্য।"

অ্যাকাউন্ট আছে শুনে অনন্ত ধাক্কা খেল। তার পরামর্শ না নিয়েই অলু ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে শুরু করে দিয়েছে। নিজেই হিসেব করে দুশো টাকা দিচ্ছে সংসারের জন্য।

অথচ এমন দিনও গেছে টিপেটিপে ষাট টাকায় মাস চলেছে। তার মনে হল, সংসার থেকে অমরের মত অলুও বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে। তাকে আর ধর্তব্যের মধ্যে রাখছে না।

অনন্ত টাকাটা হাতে নেয়নি। অলুকে বলেছিল টেবলে রাখতে। আর বলেছিল পরেরবার থেকে মার হাতেই যেন দেয়।

একদিন অলু তার মাকে জানাল সে বিয়ে করবে। ছেলেটির নাম শান্তনু। কলেজে তার দু'বছরের সিনিয়র ছিল। আধুনিক গান লেখে, রেডিওয় আর অ্যামেচার থিয়েটার দলে অভিনয় করে, খবরের কাগজে এটা-ওটা লেখে, ভবানীপুরে নিজেদের বাড়ি, অবস্থা ভাল। তবে চাকরি করে না।

রাত্রে অনন্ত খেতে বসলে শীলা ফিসফিস করে জানাল,

"অলু বিয়ে করবে, ছেলে চাকরিবাকরি করে না।"

"কি করে তাহলে?"

"তুই ওকেই জিজ্ঞেস করিস্। বেকারকে বিয়ে করবে, ওর কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

"পরে চাকরি পাবে।"

"যখন পাবে তখনই বিয়ে করবে। তুই বারণ কর।"

"আমাকে তো অলু বলেনি কিছু, যেচে বলাটা ঠিক হবে না। তাছাড়া ছেলেকে তুমিও দেখনি আমি দেখিনি।"

পর দিন অফিস যাবার আগে অলু তাকে বলেছিল। অনন্ত চুপ করে শুনে যায়।

"রেজিস্ট্রি করব। গাদাগুচ্ছের খরচ করার মত টাকা আমার নেই।"

আমার নেই মানে? অলু কি নিজের বিয়ের খরচ নিজেই করবে? অনন্ত আর একটা ধাক্কা খেল। নিজের দায় নিজেই বইবে, ভাল। তাকে যদি অগ্রাহ্য করতে চায় করুক।

"তুই ভেবেচিন্তে দেখেছিস?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের বংশে কেউ রেজিস্ট্রি বিয়ে করেনি।"

"করেনি, এবার হবে।"

অনন্ত একবার শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আলনা থেকে শার্টটা তুলে নিয়ে বলল, "আমরা কেউ কিন্তু দায়ী থাকব না যদি কিছু ঘটে।"

"কি ঘটবে?"

"ভালবাসার বিয়ে তো...দেখলুম না তো কাউকে সুখী হতে।"

"তুমি আবার দেখলে কবে?"

অলু তীক্ষ্ণ স্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল। "তুমি তো লোকজনের সঙ্গে কোনদিন মেলামেশাই করোনি। কোনদিন তোমার একটা বন্ধু দেখলাম না, একটা বই পড়তে দেখলাম না...সিনেমা, গান, নাটক, বেড়ানো কিছুই না। শুধু কাজে যাওয়া আর ঘরে বসে থাকা...তুমি ভালবাসার বিয়ের কি বোঝ আর কি জান, শুধু তো ভালো ছেলে

হয়েই জীবন কাটিয়েছ।"

অনন্ত হতভম্ব হয়ে, শার্টের মধ্যে দুহাত গলান অবস্থায়, তাকিয়ে থেকেছিল। দরজার কাছে শীলা দাঁড়িয়ে।

"অলু কাকে কি বলছিস তুই! তোর দাদা সতেরো বছর বয়স থেকে সংসারের হাল ধরেছে, তোদের মানুষ করেছে, আর তুই কিনা চাকরি পেয়ে সব ভুলে গেলি?"

অলুকে বিচলিত দেখাল কিন্তু রাগ পড়েনি।

"ভালবাসার বিয়ে নিয়ে দাদা বাজে মন্তব্য করল কেন? আমি অসুখী হবো এমন ইঙ্গিত দেওয়ার কি দরকার ছিল? আমি তো অনু নই যে সবাই মিলে যেমন তেমন একটা বিয়ে দেবে আর মেনে নেব।"

"যেমন তেমন? ওকে জিজ্ঞেস করে মত নিয়ে তবেই বিয়ের কথা বলেছি।"

"মতামত দেবার মত বুদ্ধি তখন ওর হয়নি, হলে বিয়ে করত না। তোমরা ওর জীবনটা নষ্ট করেছ।"

অলু দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ওর জুতোর শব্দ সদরে না পৌঁছন পর্যন্ত কেউ কথা বলেনি।

"অলুর জীবন কি নষ্ট হয়েছে, মা?"

"পাঁচটা ছেলেমেয়ে পেটে ধরেছে, সতীনের ছেলেকে নিজের পেটের ছেলের থেকে আলাদা করে দেখে না, অনু আমার কত ভাল মেয়ে। ও সুখী হবে না তো কে হবে! জামাই বাড়ি করবে বলে জমি কিনেছে..."

অনন্ত আর শোনেনি। সে কাজে বেরিয়ে গেছল। সারাদিন তার মাথার মধ্যে ঘুরেছে অলুর কথাগুলো। সত্যিই সে মেলামেশা করেনি। সত্যিই তার কোন বন্ধু নেই। ভালবাসার কিছুই সে জানে না। অলুর প্রত্যেকটা কথাই সত্যি, ভালো ছেলে হয়েই তার দিনগুলো কেটে গেল।

রাত্রে অনন্তের ঘুম এল না। এন্টালির বাড়িতে ফাটা ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, রাজমিস্ত্রি নিয়ে আজ গেছল কাজ বুঝিয়ে দিতে। ফেরার সময়, প্রতিবারের মত, মিনতি করের ঘরে যায়।

"রোজই অপেক্ষা করি এই বুঝি দারোয়ান এসে জিনিসপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে আমায় বার করে দেবে। রাতে ঘুম হয় না।"

"আপনাকে তো বলেছি, এসব চিন্তা করবেন না। যদি তুলেই দিত, তাহলে দশ-বারো বছর আগেই দিত। আমি যতদিন আছি আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

"পেটের ছেলেও এত করে না, তুমি যা করছ আমার জন্য।"

ঘরের মধ্যে লম্বা পর্দাটা আর নেই। অনন্ত যখনই আসে দরজার কাছে চেয়ারটায় বসে। ছবিটা একই জায়গায়, একই রকম উজ্জ্বল। শুধু ফ্রেমের রঙটা ধূসর হয়েছে।

"এখনো আপনি আগের মতই ভালবাসেন?"

চোখ পিট পিট করলেন মিনতি কর। আরো শীর্ণ, চোয়ালের চামড়া শিথিল, চোখের

কোণে ভাঁজ, পিঠটা একটু বাঁকা কিন্তু হাসিটা বাচ্চা মেয়ের মত।

"এই নিয়ে কতবার জিজ্ঞাসা করলে বলতো?"

"চারশো তিয়াত্তরবার"

"ঠাট্টা নয়, ঠাট্টা নয়...তোমার ভীষণ কৌতূহল ছবিটা সম্পর্কে,...নেবে ওটা?"

অনন্তর বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠেছিল। আচমকা তার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল কথাটা, "নেব।"

"আমি মরে গেলে, তার আগে নয়।"

মিনতি কর চা তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় প্রসঙ্গটা বন্ধ হয়ে যায়।

ভোররাতে অনন্তের চোখে ঘুম নেমে আসে।

তিনদিন পর সন্ধ্যায় অলুর সঙ্গে একটি যুবক এল। উঠোনে দাঁড়িয়ে অনন্ত তখন খালি গায়ে ভিজে গামছা রগড়াচ্ছিল। যুবকটিকে দেখা মাত্র তার মনে পড়ল রমেনকে। দাঁড়ানো, তাকানো ছাড়াও অসম্ভব মিল রয়েছে শরীরের গড়নে। আপনা থেকেই তার দৃষ্টি অলুর গলায় পড়ল। গৌরীর স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে এলেও সবুজ পাথরের মালাটা জ্বলজ্বলে রয়েছে। এত বছরে একবারও ওর সঙ্গে দেখা হল না।

"শান্তনু...এই হচ্ছে আমার দাদা।"

হাত তুলে নমস্কার করল শান্তনু। অনন্ত কোনরকমে হাতের মুঠি দুটো বুকের কাছে তুলল। কোন কথা বলল না।

"তোমার সঙ্গে কথা বলবে বলে এসেছে।"

"কি কথা।"

নিজের গম্ভীর, নিস্পৃহ স্বরে অনন্ত অবাক। তার যে কোন আগ্রহ নেই সেটা ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে।

"বিয়ের কথা বলতে এসেছি।"

"মা'র সঙ্গে।"

শান্তনুকে নিয়ে অলু মা'র ঘরে ঢুকল। একটু পরেই অনন্ত নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। পার্কে একটা রাজনৈতিক সভা চলছিল, সভার পিছনে বসে বক্তৃতা শুনতে শুনতে তার মনে হল পনেরো বছর আগে সে ঠিক এই কথাগুলিই শুনেছে এই পার্কে। লোকগুলোর বক্তৃতার স্বর এবং ভঙ্গি একটুও বদলায়নি। শ্রোতারাও পনেরো বছর আগের মতই হাততালি দিল।

অলু বিয়েতে সাক্ষী হবার জন্য অনন্তকে বলেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজী হয়ে যায়। নিজে পছন্দ করে বিয়ে করছে কারুর মতামতকে গ্রাহ্য না করে। সুতরাং ভবিষ্যতে অলুর কিছু বলার মুখ থাকবে না।

শীলার কাছ থেকে অনন্ত শুনল, বিয়ের পর অলু শ্বশুরবাড়ি যাবে না। শান্তনুর মা, বৌদি আর দাদার আপত্তি আছে এই বিয়েতে।

"নগদ, গয়না, আলমারি, খাট এইসব আশা করেছিল।"

"ছেলের তো কোন রোজগারই নেই।"

"তাহলেই বা বড় বংশ, নিজেদের বাড়ি, বড় বড় নামী আত্মীয়-স্বজন···ওরা ঠিক করেছে ঘর ভাড়া নিয়ে আলাদা থাকবে।"

"তার মানে অলুকেই সব খরচ টানতে হবে। এ রকম বিয়ের কি যে দরকার···যাক গে ওরা যা ভাল বোঝে করুক।"

"তুই সেদিন আর শার্ট পরিস না, পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে যাস।"

অনন্ত পাঞ্জাবি পরেই রেজিস্টারের অফিসে হাজির হয়েছিল অলুর সঙ্গে। সে বাসে ওঠার কথা বলেছিল, অলু হাত তুলে ট্যাক্সি থামিয়ে বলেছিল 'আজ আর বাসে নয়।' ট্যাক্সি থেকে নামার পরই তার মনে পড়ে জীবনে এই দ্বিতীয়বার সে ট্যাক্সিতে উঠল! খুব আশ্চর্য হয়ে সে মুখ ফিরিয়ে গাড়িটাকে বারবার দেখে চিনে রাখার চেষ্টা করে। ফাগুতোলার জন্য প্রথম ট্যাক্সি করে গেছল।

শান্তনু আর তার দুই বন্ধু তখনো আসেনি। অলু অধৈর্য হয়ে কয়েকবার তার হাতঘড়ি দেখল।

"কটায় আসবে বলেছে?"

"একটায়।"

দেয়াল ঘড়িতে তখন একটা-দশ। রেজিস্ট্রারের বন্ধ ঘরের মধ্যে দুজন নারী-পুরুষ। তারা বিয়ের ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছে।

"বোধহয় ট্রাফিক জ্যামে পড়েছে।"

আরো দশ মিনিট পর শান্তনু এল। ঝোলা কাঁধে চাপদাড়িওলা সঙ্গে একজন। অলুকে দেখে পরিচিতের হাসি হাসল।

"আরে প্রশান্তর জন্য বারোটা থেকে অপেক্ষা করে করে···দাদা ভাল আছেন···শেষকালে আর দাঁড়ালাম না। অরুণ ইনি অলুর দাদা, আর এ হচ্ছে আমার বাল্যবন্ধু অরুণ সেন।"

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিয়ে শেষ করে, রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে ওরা বেরিয়ে পড়েছিল। অলুর হাতে গোলাপের স্তবক, অরুণের দেওয়া। বুকের কাছে রেখে মাথা নামিয়ে মাঝেমাঝে গন্ধ শুঁকছিল। শীলা একটা সিঁদুরের কৌটো অনন্তকে দিয়ে বলেছিল, "বিয়ের পর অলুর সিঁথিতে শান্তনু যেন দেয়।"

অনন্ত ভুলে গেছল। রেজিস্ট্রারই বললেন, "সিঁদুর এনেছেন?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে।"

অনন্ত পকেট থেকে বার করে কৌটোটা। শান্তনু নস্যির টিপের মত সিঁদুর তুলে অলুর সিঁথিতে মাখিয়ে দেয়। অলুর চোখদুটো মুদে এল, চামড়া ভেদ করে আলতো একটা আভা মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল। নতুন সিল্কের শাড়ি পরেছে, হালকা গোলাপি জমিতে, রজনীগন্ধার ঝাড় উঠেছে পায়ের কাছ থেকে হাঁটু পর্যন্ত। আজ পরবে বলেই কিনেছে।

অনন্ত মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ভাবল, অলুর যে এত রূপ তা তো কখনো জানতুম না!

অরুণ হঠাৎ উলু দিয়ে উঠল। অনন্ত সভয়ে তাকাল রেজিস্ট্রারের দিকে, তিনি হাসছেন।

"এ আর কি, টেপরেকর্ডার এনে সানাইও বাজায়।"

অলু প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই অনন্ত তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। ছলছল করছে ওর চোখ।

"অনেক কথা বলেছি, মাপ করে দিও।"

"আরে ও কিছু নয়, কিছু নয়।···ও রকম হয়ই···ভাল করে সংসার কর, সুখে থাক···"

অনন্তর গলা ধরে গেল। সে বোকার মত হাসল সকলের দিকে তাকিয়ে। শান্তনু প্রণাম করল।

ঝোলা থেকে সন্দেশের বাক্স বার করে অরুণ এগিয়ে ধরল।

"এবার মিষ্টি মুখ···এই নিয়ে এগারোটা বিয়ের সাক্ষী হলুম, এখানেই দু'বার হল। দেখছি প্রফেশনাল উইটনেস হয়ে যাচ্ছি···এবার থেকে ফী নিতে হবে।"

পরিবেশটা হাল্কা হয়ে গেল। কিন্তু অলু কখন যে তার হাত ব্যাগ থেকে টাকা বার করে রেজিস্ট্রারের টেবলে রেখেছে, অনন্ত বুঝতে পারেনি। তার পকেটে তিরিশ টাকার বেশি নেই। বেরোবার সময়ও সে ভাবেনি রেজিস্ট্রারকে টাকা দিতে হবে। অন্যরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে মেয়ের দাদা টাকা বার করল না। অলু কি আশা করেছিল, এই খরচটা দাদা দেবে?

সে অপ্রতিভ বোধ করল অন্তত এই টাকাটা তারই দেওয়া উচিত ছিল। কিছুই তো সে অলুকে দেয়নি, শাড়ি পর্যন্ত নয়। বিয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে অলুই খরচ করেছে। জেদী মেয়ে।

অনন্ত বিমর্ষ বোধ করেছিল রাস্তায় বেরিয়ে। তার মনে হচ্ছে কি যেন একটা সে হারাচ্ছে। এক সময় বাবা, মা, সে, তিনভাই বোনে পরিবারটা ভরা ছিল। একে একে লোক কমে যাচ্ছে। এখন তো সে আর মা। যখন প্রচণ্ড অর্থাভাব তখন এতটা নিঃসঙ্গ বোধ হয়নি। কি করে পরের দিনটায় খাওয়া জুটবে সেই ভাবনাটা তাকে ব্যস্ত রাখত। ধীরে ধীরে ভাবনাটা মেঘ গর্জনের মত আকাশে গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে মিলিয়ে গেছে। এখন অদ্ভুত নৈশব্দ্য।

"আমি যাই এখন।"

"সে কি, আমরা যে এখন কোথাও বসে খাব ঠিক করেছি, আপনিও থাকবেন আমাদের সঙ্গে।"

"না ভাই," শান্তনুর কাঁধে হাত রাখল অনন্ত। "অলু জানে আমি ভাত খেয়েই এসেছি। তাছাড়া অম্বলটা আবার একটু বেড়েছে, বাইরের খাবার খাব না।"

"কিন্তু আমরা যে···"

"তাতে কি হয়েছে। অলু এদের নেমন্তন্ন কর, রোববার আসতে বল।"

অলু দুজনের উদ্দেশ্যে বলল, "শুনলে তো অরুণ, রোববার নিশ্চয় আসবে ?"

"নিশ্চয় নিশ্চয়, খাওয়ার ব্যাপারে ফেল করি না।"

অলু জানিয়ে রাখল সে অফিসের দু-তিনজনকেও বলবে।

বাসে রড ধরে দাঁড়িয়ে আসার সময় অনন্তের মনে হল, বোধহয় এরা সুখীই হবে। ভালবাসার কিছুই তো সে জানে না। অলু এখন বাপের বাড়িতেই থাকবে যতদিন না কোথাও ঘর পায়।

বাপের বাড়ি ! অনন্ত অবাক হয়ে ভাবল, অলুর বা অলুদের বাড়ি আর নয়, আজ থেকে তাদের বাড়ি ওর বাপের বাড়ি। মেয়েটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এই সংসার থেকে। অবশ্য হতোই।

অসম্ভব শ্রান্তি নিয়ে অনন্ত বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ল। আজ সে কাজেই যাবে না। এই বছরের প্রথম কামাই, গত বছরে একদিনও নেই, তার আগের বছর ইনফ্লুয়েঞ্জায় দশদিন।

শীলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে যাচ্ছে তক্তাপোশের পাশে দাঁড়িয়ে। অনন্ত কপালের উপর হাত রেখে চোখ বুঁজে।

"শুধু একজন, বন্ধু !"

"আবার ক'জন আসবে ? একি টোপর পরে বিয়ে যে সঙ্গে পঞ্চাশ-একশো বরযাত্রী আসবে।"

"দুটো মালা কিনে নিয়ে গেলি না কেন ?"

অনন্ত উত্তর দিল না।

"মন্তর পড়েছিল ?"

"না।"

"তাহলে ! এসব বিয়ে কি শুদ্ধ ?"

অনন্ত চুপ।

"ও কখন ফিরবে কিছু বলেছে ?"

কোন উত্তর নেই।

"অলু কি করল, শুধু সই ?"

"হ্যাঁ।"

'সিঁদুরটা শান্তনুই দিল তো ?'

জবাব না পেয়ে শীলা আধ মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কপাল থেকে হাত নামিয়ে অনন্ত তীব্র চাহনিতে তাকাল।

"এবার শুধু আমরা দু'জন এই সংসারে।"

শীলা অপ্রত্যাশিত এই কথাটার কোন তাৎপর্য খুঁজে পেল না। শুধু বলল, "ফাঁকা ফাঁকা লাগবে এরপর।" কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে যোগ করল, "এবার তুই বিয়ে কর্।"

"কেন ?"

"ছেলেপুলে না থাকলে কি ঘর মানায় ! বংশরক্ষা করতে হবে তো।"

"অমর আছে।"

"থাকলেই বা, পুরুষ মানুষের বিয়ে না করলে কি চলে ? এবার আমি মেয়ে দেখব।"

"না।"

"তুই নিজে পছন্দ করে বিয়ে করবি ?"

"না।"

"তাহলে ?"

অনন্ত চোখ বন্ধ করে হাতটা আবার কপালে রাখল।

"আর টানতে পারব না, আর ভালো লাগে না, আমি এবার জিরোব।"

"তা জিরো, এত বছর ধরে কম পরিশ্রম করেছিস, তাই তো সবাই বলে···"

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত অনন্তের দুটো হাত ছিটকে গেল দুধারে। চিৎ হয়ে শোয়া শরীরটা এক ঝাঁকুনিতে উঠে বসল। মুঠোকরা দুই হাত তুলে চীৎকার করে উঠল, "সবাই বলে আমি ভাল ছেলে, ভাল ছেলে, ভাল ছেলে···সবাই খুশি তো ? কথা দিচ্ছি আমি ভাল ছেলেই থাকব।"

ধীরে ধীরে সে আবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থাকা তার দুই চোখের কোল বেয়ে কয়েক ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

পাঁচ বছর পর অনন্ত বিয়ে করল।

শীলার ক্যান্সার ধরা পড়া, দিল্লি থেকে অমরের আসা এবং শীলাকে নিয়ে যাওয়ার ছ'মাস পরেই সে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। বয়ানটা কেমন হবে তাই নিয়ে সে দিন চারেক চিন্তার মধ্যে কাটায়। পাত্রী চাই কলমের থেকে শব্দ বাছাই করে প্রথমে সে বিজ্ঞাপনের খসড়া করেছিল : দঃ রাঢী কায়স্থ (৩৫), স্বাস্থ্যবান, একা, মাঃ আয় ১০০০। গৃহকর্মনিপুণা রুচিশীলা নম্র পাত্রী চাই। অন্য জাত বা বিধবাতেও আপত্তি নাই।

দুটো মিথ্যে কথা সে লেখে। বয়সটা প্রায় চারবছর কমিয়েছে, মাসিক আয় বাড়িয়েছে প্রায় দেড়শো টাকা। তারপর আয়নার সামনে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ নিজেকে খুঁটিয়ে দেখেছিল। পঁয়ত্রিশ বছরের মত তাকে মনে হয় কি ?

আয়নার খুব কাছে মুখটা এনেও সে বয়স বুঝতে পারছিল না। সামনের চুল উঠে গিয়ে কপালটাকে চওড়া করে দিয়েছে। সেখানে দুটো রেখা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভুরুতে কয়েকটা চুল খোঁচা হয়ে উঠে রয়েছে : কানদুটো ছোট, পাশে ছড়ানো ; কিছু চুল খুব ভালভাবেই কানের গর্ত থেকে উঁকি দিচ্ছে ; চোখদুটো গোল, ভিতরে বসা ; নিচের ঠোঁটটা পুরু, কাঁধটা সরু, বুকের খাঁচাটা ছোট, পেটটা ঝুলে থলথলে। মোটা কোমরের দুধারে চর্বির ভাঁজ। বাহুদুটি শীর্ণ, মেয়েদের মত নরম।

অনন্ত একটি একটি করে নিজের দেহের ত্রুটি বার করে খসড়া থেকে প্রথমে স্বাস্থ্যবান কথাটা বাদ দিয়েছিল। তবে পঁয়ত্রিশ বছরটা এমনই, শোনামাত্র মনে হয় পরিণত যুবক, বয়সটা যেন ত্রিশের থেকে একটু বেশি অথচ চল্লিশের কাছাকাছি নয়। কিন্তু সে সাহস পায়নি নিজেকে ত্রিশের দিকে নিয়ে যেতে।

তবু নিশ্চিত হবার জন্য তার কাছাকাছি বয়সীদের সে লক্ষ্য করে গেছে দু'দিন ধরে। রাস্তায়, বাজারে, বাসে সর্বত্রই তার চোখ ছুঁকছুঁক করেছে। যাকেই মনে হয়েছে মধ্য-তিরিশ তন্নতন্ন করে তার গড়ন, হাবভাব, চলনের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, আর মনে হয়েছে পঁয়ত্রিশে যা হওয়া উচিত তার সেই রকম শরীর নয়। সে ঊনচল্লিশই লেখে।

খসড়ায় হাজার টাকা আয় বসাবার সময় সে দ্বিধায় পড়েছিল। হাজার কথাটা শুনতে ভাল, মনেও গাঁথে। তাছাড়া সে তো মাইনের টাকা গুণেগুণে বৌয়ের হাতে তুলে দেবে না !

তবে পাত্রীদের তরফ থেকে খোঁজখবর নিশ্চয়ই করবে। নিশ্চয় অঘোর এস্টেটে কেউ যাবে, কে কত মাইনে পায় সেটা বার করে নেওয়া মোটেই শক্ত নয়। তারা জেনে যাবেই সে একটা মিথ্যাবাদী। হাজার টাকাটা সে কেটে দেয়। বিজ্ঞাপনের ফর্ম ভর্তি করে, টাকা দিয়ে দুপুরে খবরের কাগজের অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পরই অদ্ভুত একটা উত্তেজনা তাকে গ্রাস করে। সারাদিন তার শরীরের তাপ এমন অবস্থায় থাকে যে

রাত্রে হোটেলে ভাত মুখে দিতে পারে না। দু গ্রাস কোন রকমে চিবিয়েই উঠে পড়ে।

"কি হল অনন্তবাবু, রান্নায় কিছু..."

মালিক অবনী দত্তর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, "শরীরটা ভাল নেই।"

"তাই বলুন। এতদিন খাচ্ছেন, এমন তো কখনো দেখিনি। অম্বলটা বোধহয় বেড়েছে।"

"হ্যাঁ।"

রাতে ঘুম এল না। সারা একতলায় সে একা। বিজ্ঞাপনেও 'একা' শব্দটা বসিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনটা সে দিল কেন ? তার কি বিয়ে করার বা কোন স্ত্রীলোককে ঘনিষ্ঠ ভাবে পাওয়ার খুবই কি দরকার ? এতটা বছর তাহলে কাটল কি করে !

ঘর পেয়ে অলু চলে যাবার পর, যখন সে আর মা একই কথা, একই অভ্যাস, একই গণ্ডির মধ্যে দিন, হপ্তা, মাস, বছর কাটিয়ে গেছে তখন সে কিছু বোধ করেছিল কি ?

কি ভাবে তার দিন কেটেছে ? অনন্ত গত পাঁচ বছরের এমন কোন স্পষ্ট ছবি দেখতে পেল না যা দিয়ে সে কোন তারিখ, কোন ঋতু, কোন মানুষকে সনাক্ত করতে পারে। তার ইন্দ্রিয়গুলো এমন কোন আবেগ ধরে রেখে দেয়নি যা তাকে ভালো কোন স্মৃতি দিতে পেরেছে। দেখা শোনার সব কিছুই তার কাছে অর্থপূর্ণ আবার অর্থহীন মনে হয়েছে।

একঘেঁয়ে দিন, ভ্যাপসা অথবা ভিজে। ছোটবেলা থেকে সে একই গন্ধ পেয়ে আসছে বিছানা, আলমারি, বাসন, কলঘর সবকিছু থেকেই। বাজার যাওয়া, অঘোর এস্টেটে যাওয়া...খাতা, বিল-বই, তাগিদ, মামলা, ভাড়াটেদের হাজার অভিযোগ। আর হাঁটা, যেটা তার একমাত্র বিলাস।

গৌরীদের চায়ের দোকানটা উঠে গেছে, কমলা বাইণ্ডার্সের প্রসাদ ঘোষ মরে গেছে, তার ছেলে এখন বসছে। পুরনো লোকেদের মধ্যে আছে শুধু ল্যাংড়া গুরু দাস। অন্য কোথাও কাজ জোটাতে পারেনি।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে, একটা ছেলে কিছুদিন কাজ করেছিল...সে তো বহু বছর আগে, পরেশদা তারপরই কোরগুটা অপারেশন করাতে গিয়ে মরে গেল।"

একদিন সে সিনেমা দেখতে টিকিট কেটে হলে ঢুকেছিল। হিন্দি ছবি, কিছুক্ষণ পরই বিরক্ত বোধ করতে থাকে। বিরতির সময় বেরিয়ে আসে। এতগুলো লোক টানটান হয়ে চেয়ারে বসে দেখছে অথচ তার ভালো লাগল না।

সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে গেছে। কিছুক্ষণ বসে থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে। পার্কে বসে তাস খেলা দেখেছে। মা চুপ করেই থাকে, ইদানিং আর বেশি কথা বলত না। সাধন বিশ্বাস একরাতে থ্রম্বসিসে মারা গেলেন। সে শ্মশানে গেছল। উৎপল এখন বাবার চেয়ারটায় বসে। পাড়ার দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি ছিল গত বছর।

অনু বছর সাতেক আগে কটক থেকে এসেছিল ওর স্বামীর গলব্লাডার অপারেশন করাতে। সঙ্গে আসে শুধু ভাসুরপো। সারাদিন খুব চিন্তায় থাকত। এখন সে নতুন

বাড়িতে থাকে, বাঙ্গবার যেতে বলেছে। চিকিৎসায় হাজার দশেক টাকা খরচ করে গেছে।

অলুর সঙ্গে দেখা নেই সাড়ে তিন বছর। বেহালায় থাকে। মা দিল্লি যাবার দিন দশ আগে বিকেলে এসেছিল, তার সঙ্গে দেখা হয়নি। শান্তনুকে এক সন্ধ্যায় নীলরতন হাসপাতালের গেটের কাছে দেখেছিল কথা বলছে একজনের সঙ্গে। শান্তনু টলছিল। লোকটিকে বারবার জড়িয়ে ধরছিল। সে দূর দিয়ে চলে যায়।

মাসে দু-তিনবার যখন সে এন্টালির বাড়িতে যায় মিনতি করের সঙ্গে তখন দেখা করে কিন্তু আর ভাল লাগে না কথা বলতে। আর ভাল লাগে না ছবিটার দিকে তাকাতে। নন্দকিশোরের ভাইপো একতলায় ওর ঘরের সামনে লম্বা প্যাসেজটায় সন্ধ্যার পর চোলাই মদের কারবার ফেঁদে বসে। এলাকায় এখন সে নামকরা মস্তান। অনন্ত সাহস পায় না কিছু বলতে। নন্দকিশোর পানের দোকান একজনকে ইজারা দিয়ে কসবায় চলে গেছে। সে মাসে মাসে পাঁচশো টাকা পায় দোকান থেকে। নন্দকিশোর চারটে গোরু কিনে কসবায় খাটাল করেছে, রেশন দোকানও দিয়েছে। মাসে একবার দুবার আসে। চোলাইয়ের কথা বলতেই, ম্লান মুখে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, "সবই এই। দিনকাল কিরকম করে যে বদলে গেল। কত ভাল ছেলে ছিল। আমার কথায় ওকে কাজ দিলেন...আমার লজ্জা করে।"

মিনতি কর এখন আর উচ্ছেদের ভয় দেখেন না। ওষুধ কোম্পানিটা উঠে গেছে। সেখানে থেকে চব্বিশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। ভাড়া দিতে চেয়েছিলেন। অনন্ত বলেছে দরকার কি, যেমন চলছে চলুক।

"সন্ধ্যের পর বড্ড ভয় করে। ঘর থেকে বেরোতে পারি না, কলঘরেও যেতে পারি না...আর কি বিশ্রী গন্ধ। দরজা জানলা বন্ধ করে রাখি, হাঁপিয়ে যাই।"

অনন্ত চুপ করে শোনে। বৃদ্ধা হয়ে গেছেন কিন্তু যথেষ্ট সমর্থ। টিউশানি করে যাচ্ছেন, দোকান, বাজার, রান্না, জল তোলা নিজেই করেন। কিন্তু কতদিন করবেন ? সে বিষণ্ণ হয়ে যায়। ওর ভালোবাসা এখনো কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের মত তীব্র আছে কি ? ছবি আগলে থাকতে থাকতে ব্যাপারটা কি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়নি ? এখন তার মনে হয় বাড়াবাড়ি, দ্যাখানেপনা।

সন্ধ্যায় অনন্ত বাড়িতে ফিরে নিজের ঘরে শুয়ে থাকে। একটা ট্রানজিস্টর কিনেছে। মাঝেমাঝে শোনে। গান, বাজনা, কথিকা শোনার কোন বাছবিচার নেই। নাটক হলে মা দরজার কাছে এসে বসে। দোতলায় টিভি এসেছে। সে এখনো টিভি-তে কোন অনুষ্ঠান দেখেনি।

পাত্রীর জন্য বিজ্ঞাপনটা কেন দিল তার কোন কারণ অনন্ত খুঁজে পায়নি। অমর হঠাৎ মাকে নিয়ে চলে যাবার পর আচমকা নিঃসঙ্গতার যে গর্তে সে পড়ে গেছে তাই থেকে উঠে আসার জন্যই কি একজন সঙ্গী চাইছে ? কিন্তু সে ছোটবেলা থেকেই তো নিঃসঙ্গ।

তিরিশ হাজার টাকার কাছাকাছি ব্যাঙ্কে জমেছে। ভাবলে তার অবাক লাগে। কি করবে টাকাগুলো ! কোন সখ, কোন বাবুয়ানি নেই ফলে তার কোন খরচ নেই। মিনতি করের মতই কী দিন কাটাতে হবে ? যদি কঠিন অসুখ করে, সেবা শুশ্রূষার দরকার হয়, কে তাকে দেখবে !

রাত্রে অনন্তের ঘুম হল না। তার মনে হল, স্ত্রীর থেকেও তার বেশি দরকার একটা মানুষ, যে কিছু একটা করবে তার নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে।

রবিবারের কাগজে তার বিজ্ঞাপনটা বেরোবার সাতদিন পর সে খবরের কাগজের অফিস থেকে এগারোটি চিঠি আনল। রাত্রে চিঠিগুলো মন দিয়ে পড়ল। সবগুলোই কলকাতার এবং স্বয়ং পাত্রীদেরই লেখা। তিনটি চিঠি বেছে নিয়ে সে স্থির করল উত্তর দেবার আগে লুকিয়ে এদের একবার দেখে নেবে।

ঊর্মিলা দেব স্কুল-শিক্ষিকা। তার চিঠিতে দেওয়া ঠিকানা মত সে স্কুলে বেরোবার সময় আন্দাজ করে জীর্ণ একটা বাড়ির দিকে চোখ রেখে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে সেই বাড়ি থেকে একজনকে বেরোতে দেখল যাকে তার মনে হল স্কুল-শিক্ষিকা। সামনে দিয়ে যাবার সময় একবার অনন্তের দিকে চাইল। তাদের চোখাচোখি হল। অনন্তের মনে হল বিনা অনুমতিতে তার দিকে তাকানর জন্য যেন কৈফিয়ত চাইল চাহনি মারফত। এসব মেয়েমানুষ খাণ্ডারণী হয়। সে নাকচ করে দিল ঊর্মিলা দেবকে।

তার দ্বিতীয় অভিযান সত্তেরর-বি রাধিকাপ্রসন্ন মিত্র লেনে। একতলা টিনের চালের বাড়ি। রাস্তার দিকে সামনের ঘরে দুটি জানালা। পিছনে একটা বটগাছ। চাকুরে নয় সুতরাং বাড়ি থেকে বেরোবার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। দু-দিন বাড়িটার সামনে দিয়ে সে হেঁটে গেল। জানলায় একটা মুখও দেখতে পেল না, দরজাটাও বন্ধ।

তৃতীয় দিন বিকেলে সে কড়া নাড়ল। মিনিট দুয়েক পর ভিতর থেকে নারীর কণ্ঠে প্রশ্ন এল, "কে ?"

"আমি, একবার কথা বলতে চাই।"

দরজা খুলে আটপৌরে ঢিলেঢালা বেশে, ঘুম ভাঙা ফুলো চোখে যে দাঁড়াল তার নাম রেবতী সেনগুপ্ত। মাজা গায়ের রঙ, দীর্ঘাঙ্গী, ভ্রু-র চুল তুলে চোখদুটি সাজানো, চোখা নাক, ডিম্বাকৃতি মুখ এবং মুখে বিস্ময়।

"কাকে চাই !"

"এখানে কি রেবতী সেনগুপ্ত থাকেন ?"

"আমিই।"

"আপনি কি কাগজের একটা পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের কোন জবাব দিয়েছেন ?"

রেবতী বিব্রত হল। শাড়ির আঁচলটা কাঁধে তুলে দিয়ে বলল, "হ্যাঁ দিয়েছি...আপনি ?"

"বিজ্ঞাপনটা আমি দিয়েছি, আমার জন্যই।"

রেবতী তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "একটু দাঁড়ান।"

দরজা ভেজিয়ে ভিতরে চলে গেল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই একটি তরুণী দরজা খুলে তাকে ভিতরে আসতে বলল। মুখের আদল থেকে মনে হল রেবতীর বোন।

দরজার পাশেই ঘর। তক্তাপোশে লোটানো তোশক আর বালিশ একটা রঙিন নকশাদার বেডকভারে ঢাকা। অনন্তের মনে হল, এখুনি ঢেকে দেওয়া হয়েছে। ঘরের দরজায় এক প্রৌঢ়া বিধবা দাঁড়িয়ে।

"রেবতী আমার বড় মেয়ে। আমার তিন মেয়ে, তারপর একছেলে। ওদের বাবা সাত বছর আগে মারা গেছেন। বিজ্ঞাপনটা রেবতীই প্রথম দেখে।"

"আমার নাম অনন্ত দাস। চিঠির জবাব না দিয়ে নিজেই চলে এলুম। বিজ্ঞাপন বা চিঠি থেকে সবকিছু বোঝা যায় না তো। চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাওয়াই ভাল, আমারও বাবা নেই, বছর কুড়ি হল মারা গেছেন।"

সেই প্রথম তার রেবতীদের বাড়িতে যাওয়া। এরপর বাকি চিঠিগুলো নিয়ে তাকে আর মাথা ঘামাতে হয়নি।

সেদিন ঘণ্টাখানেক সে ছিল। রেবতী তাকে চুম্বকের মত টেনেছে, তাকে উত্তেজিত করেছে, রাত্রে ঘুম হয়নি।

এরপরও তিনবার সে গেছে। পরিবারের সকলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তার নিজের কথা, ভাই বোন মায়ের কথা, কষ্ট করে সংসার চালানো, অঘোর এস্টেটে অপ্রত্যাশিত চাকরি পাওয়া, বোনেদের বিয়ে, অমরের চলে যাওয়া, মা-র ক্যান্সার—সবই সে বলেছে।

ওদের নিজেদের বাড়ি, দুখানি ঘর। তিনদিনের মধ্যে দু-দিনই সন্ধ্যার সময় রেবতী বাড়ি ছিল না।

"এইমাত্র বেরোল এক বন্ধুর সঙ্গে, কখন আসবে ঠিক নেই। আপনি কি বসবেন?"

অনন্ত কিছুক্ষণ বসে থাকে। দু-একটা কথাও বলে। চা খায়, সঙ্গে দুটি সন্দেশ।

তৃতীয় দিনে রেবতী বেশির ভাগ সময়ই অন্য ঘরে ছিল। অনন্ত ছটফট করছে ওকে দেখার জন্য। পাশের ঘর থেকে রেবতীর কণ্ঠস্বর পেয়ে সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারছে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটছে।

রেবতীর মা বিয়ের কথা তুললেন। "রেবতীর বাবা মারা গেলেন তখন ও বি-এ পড়ছিল, আর পড়া হয়নি। আমরা কিন্তু কিছুই দিতে-থুতে পারব না শাঁখা সিঁদুর ছাড়া।"

অনন্তের মনে পড়ল অন্যর বিয়ের কথা। সে বলল, "দিলেও আমি কিছু নোব না। আপনারা আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিন। আমি কোথায় থাকি, ঘরদোর কেমন সেটাও তো একবার দেখবেন।"

ঠিক হয় রেবতীকে নিয়ে গিয়ে অনন্ত তার একার সংসার দেখিয়ে আসবে। সন্ধ্যা নাগাদ সে রেবতীদের বাড়ি যায়। তখন ঘরের তক্তাপোশে বালিশ বগলে রেখে কাত

হয়ে শুয়ে একটি লোক সিগারেট খাচ্ছিল। রেবতীর বোন শাশ্বতী আদুরে ভঙ্গিতে লোকটির পায়ের উপর হাত রেখে বসে। রেবতী জানলার ধাপে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল।

অনন্ত ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। ওকে দেখেই ঘরের সবাই চুপ করে তাকিয়ে রইল। অবশেষে শাশ্বতী বলল, "আসুন।"

"আজ দেখতে যাবার কথা ছিল।"

রেবতীর পায়ের দিকে তাকিয়ে অনন্ত বলল।

"আজকেই, কিন্তু আজ যে..."

অনন্তর বুক কেঁপে উঠল। রেবতী কি যাবে না? সকালে সে ঘর-দালান জল দিয়ে ধুয়েছে, কাচানো ওয়াড় বালিশ পরিয়েছে, ঝুল ঝেড়েছে, তাকের জিনিসপত্র গুছিয়েছে, স্টোভে কেরোসিন ভরে রেখেছে, যদি চা খেতে চায়! ভেবে রেখেছে ট্যাক্সিতে রেবতীকে আনবে এবং পৌঁছে দেবে।

"যাও না, কতক্ষণ আর সময় লাগবে।" লোকটি অনুমতি দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল।

"আপনি বসুন, আমি কাপড়টা বদলে আসি...ওহ্ পরিচয় করিয়ে দিই, এই হচ্ছে দিলীপদা, অনেক উপকার করেছে আমাদের, দিলীপদা না থাকলে আমাদের পরিবারটা ভেসে যেত...আর ইনি হচ্ছেন সেই ভদ্রলোক কাগজে পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।"

"ওহ্ আপনি!"

অনন্ত নমস্কার করল, লোকটি প্রতি নমস্কার না করে সিগারেটের প্যাকেটটা তার দিকে এগিয়ে ধরে।

"মাফ করবেন, খাই না।"

তক্তাপোশের নীচ থেকে একটা মোড়া বার করে দিল শাশ্বতী। অনন্ত দেয়াল ঘেঁষে বসল। তার ভিতরে অস্বস্তি। কয়েকবারই সে দিলীপদা নামটা ওদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় উচ্চারিত হতে শুনেছে। আজ সে চোখে দেখল। মাঝারি আকৃতি, ফর্সা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বুশশার্ট ও প্যান্টটা দামী কাপড়ের। এদের আত্মীয় নয়, তাহলে কে? উপকারী বন্ধু। কি উপকার করেছে যাতে ভেসে যাওয়া বন্ধ হয়!

"কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন কেন?"

"তাছাড়া উপায় ছিল না।"

"সম্বন্ধ করে বিয়ে দেবার মত কেউ নেই?"

"না।"

"কোথায় চাকরি করেন?"

"জমিদারের এস্টেটে, সম্পত্তি দেখা শোনার কাজ।"

"অ।"

দিলীপদা নিস্পৃহ হয়ে শাশ্বতীর দিকে মনোযোগ দিল।

"মাসীমা কোথায় রে ?"

"ওঘরে শুয়ে আছে, মাথা যন্ত্রণা হচ্ছে। ডাকব ?"

"থাক্। তাঁতীকে পাঠিয়ে দেব তাহলে, কখন আসবে ?"

"দুপুরে পাঠিও।"

"ভাস্বতী এই শনিবার আসবে ?"

"মেজদির কোন কথার ঠিক নেই। আসতেও পারে।"

দিলীপদা উঠে বসল রেবতী ঘরে ঢুকতেই। হাল্কা টিয়া পাখি রঙের সিল্কের শাড়িটা ওর শরীরের উঁচু-নিচু জায়গাগুলোর উপর আলতো করে বিছানো। লিপস্টিকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, হাতকাটা ব্লাউজে বাহুর ডৌল বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু অনন্ত চোখ নামিয়ে নিল।

"আমার সঙ্গেই চলো, ওদিকে একটা কাজ আছে সেরে নেব।"

বাদামী অ্যাম্বাসাডারটা অনন্ত গলিতে ঢোকার সময় দেখেছিল। সেটা যে এই লোকটিরই বুঝতে পারল যখন চাবি দিয়ে দরজা খুলে ড্রাইভারের সিটে বসল। রেবতী পিছনের দরজা খুলে দাঁড়াল।

"উঠুন।"

"আপনি উঠুন।"

"উঠব।"

অনন্ত গাড়িতে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে রেবতী সামনের দরজা খুলে দিলীপের পাশে বসল ! অনন্ত আশা করেছিল অন্যরকম।

তাদের গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে বার করা কঠিন। তাই অনন্ত ঢোকাতে বারণ করল।

"আমি এখানেই থাকছি, তুমি দেখে এস।"

দিলীপদা সিগারেট ধরাল। রেবতীকে নিয়ে গলি দিয়ে হেঁটে আসার সময় সে সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করল, "উনি কে হন ?"

"দিলীপদা ? উনি ফ্যামিলি ফ্রেণ্ড, ওর নাম দিলীপ ভড়। বিরাট বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর।"

আর প্রশ্ন না করে অনন্ত বাড়িতে ঢুকল, তালা খুলে রেবতীর দিকে তাকাল। কিছু বুঝতে পারল না। দালানের আলো জ্বালল।

চোখ ঘুরিয়ে মুখ তুলে রেবতী দেয়াল, মেঝে, কড়িকাঠ দেখছে। অনন্ত প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করছে ওর প্রতিক্রিয়া।

"রান্নাঘরটা দেখুন।"

প্রায় ছুটে গিয়ে সে রান্নাঘরের দরজা খুলল।

"মা এই জায়গাটায় বসে রাঁধত।"

রেবতী দূর থেকে দেখে ফিকে হাসল।

"দুটো ঘর।"

অনন্ত দরজা খুলে আলো জ্বালল। রেবতী দরজার কাছ থেকে উঁকি দিল।

"চলি এবার।"

"চা খাবেন ?"

"না, না, চা নয়।"

রেবতী সদরের দিকে এগোচ্ছে, অনন্ত পিছু নিল।

"খুব পুরনো বাড়ি।"

"হ্যাঁ, শুনেছি আশি-নব্বুই বছরের। পাড়াটা খুব বনেদি।"

"ভাপসা একটা গন্ধ রয়েছে। জানলাগুলো ঠিকমত বন্ধ হয় ?"

"হয়। মেঝেটা নতুন করে করার ভাবছি, দেয়ালের পলেস্তরাও...এসব করবার দরকার এতকাল হয়নি তো।"

কথাটা রেবতীর কানে গেল কিনা সে বুঝল না। রাস্তার লোকেরা ওর দিকে তাকাচ্ছে। রকে যারা বসে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে। বারান্দা থেকে ঝুঁকে আছে কয়েকটা মুখ।

দিলীপ ভড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। "দেখা হল ?"

"হ্যাঁ।"

কোন কথা না বলে ওরা গাড়িতে উঠল। স্টার্ট দিয়ে মাথা নিচু করে দিলীপ ভড় তাকাল।

"চলি তাহলে, আবার দেখা হবে।"

ফিরে এসে অনন্ত গুম হয়ে বসে রইল। রেবতী কিছুই বলল না। ঘর নিশ্চয়ই পছন্দ হয়নি। ওর মত ঝকঝকে মেয়ের পক্ষে এটা বসবাসের উপযুক্ত জায়গা নয়।

এই প্রথম সে তার বাসস্থানকে ঘৃণা করল। প্রত্যেকটা পরিচিত বস্তু, যেগুলোকে সে কখনো লক্ষ্যই করত না, তার চোখে কুৎসিত হয়ে দেখা দিচ্ছে।

অনন্ত ফাঁপরে পড়েছিল বিয়ের ব্যাপারে। সে একা, বিয়ের কাজকর্ম দেখার, করার কেউ নেই। উপরের জেঠিমা, কাকিমাদের বলা যায়, কিন্তু সে রাজী নয়। অলুকে জানানোর ইচ্ছে নেই, অনু হয়তো আসতে পারবে না, মার পক্ষেও আসা সম্ভব নয়।

"এই নিয়ে এত চিন্তার কি আছে, আমার ওখান থেকে'হবে...আমার ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটটা তো খালিই পড়ে আছে। ওখান থেকেই বর যাবে, কনে নিয়ে ফিরেও আসবে।"

দিলীপ ভড় নিমেষে সমস্যাটার সমাধান করে দেয়। অনন্ত রাজী হয়। বিয়ের দিন সকালে ক্যামাক স্ট্রিটে 'মধুবন' বাড়ির সাততলায় অনন্তের পৌঁছনর কথা। দালানের দরজায় তালা দিয়ে বিয়ের জন্যে জন্য কেনা জুতো, পাঞ্জাবি, ধুতিতে ভরা নতুন স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে বেরোবার সময় তার মনে হল দোতলায় খবরটা দেওয়া উচিত। জন্ম থেকে ওরা তাকে দেখছে।

কাকিমা রান্নাঘরে ছিলেন, অনন্তকে দেখে কৌতূহলে বেরিয়ে এলেন খুন্তি হাতেই।

"কাকিমা আজ আমার বিয়ে।"

"য়্যাঁ···ওম্মা, কোথায় বিয়ে হচ্ছে ? যোগাড়যন্তর কই, ও দিদি শুনে যাও অনন্তের আজ বিয়ে।···এ বাড়ি থেকে হচ্ছে না ?···আজকেই !"

জেঠিমা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। অনন্তকে লাজুক দেখাচ্ছে।

"হঠাৎই ঠিক হয়ে গেল জেঠিমা। আপনাদের জানাবার পর্যন্ত সময় পাইনি···এক বন্ধুর বাড়ি থেকে বিয়েটা হচ্ছে। এখানে কে করবে-টরবে, তাই বন্ধুর বাড়ি থেকে।"

"কেন রে আমরাই করতুম।"

"আবার কেন আপনাদের ঝামেলায় ফেলব।"

"বিয়ের কাজ কি ঝামেলার কাজ বাবা ? আমাদের তুই পর ভাবলি।"

"না না সেকি কথা। আপনাদের সাহায্য ছাড়া কি আমাদের চলতো।"

"খুব ভাল করেছিস। এই সেদিনই বলাবলি করছিলুম অনন্তের এবার বিয়ে করা উচিত। রোজগেরে ছেলে, এভাবে বাউণ্ডুলের মত থাকবে কেন, রেঁধে দেবারও কেউ নেই !"

"দিদি তো বলছিল জোর করে তোর বিয়ে দিয়ে দেবে। মেয়ের বাড়ি কোথায়···কে কে আছে মেয়ের, অবস্থা কেমন, বল সব।"

"আমারই মত অবস্থা, বাবা নেই। দুই বোন একভাই আর মা।"

"চাকরি করে ?"

"মেজো বোন স্কুলে পড়ায় বাইরে থাকে। এরা থাকে সিমলেয়। কাউকে নেমন্তন্ন করিনি, বৌভাতে করব।"

"আগে যদি বলতিস, আমরাই সব ব্যবস্থা করে দিতুম।"

দুজনকে প্রণাম করে সে বেরিয়ে পড়ল। ট্যাক্সি থেকে নেমে, মধুবনের সাততলায় পৌঁছে যখন সে কলিংবেল টিপল তখন বেলা প্রায় এগারোটা। পাজামা শার্ট পরা এক ছোকরা দরজা খুলে হেসে তাকে ভিতরে আসতে বলল।

"আপনার নামই তো অনন্ত দাস ?"

"হ্যাঁ।"

"বাবু সকালে টেলিফোনে বলে দিলেন, আপনার গায়ে হলুদ ছুঁইয়ে মেয়েরবাড়ি পাঠিয়ে দিতে। ড্রাইভার হলুদ দিয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি জামা খুলুন।"

বড় দালানের মত বসার জায়গায় মোটা কার্পেট মেঝে ঢাকা, সাদা দেয়াল, এককোণে দুটো বড় সোফা তার বাঁ দিকে বারান্দা। দেয়ালের ধারে একটা শূন্য টেবল ছাড়া আর কোন আসবাব নেই। তিনটে বন্ধ দরজা সে দেখতে পাচ্ছে, বোধহয় শোবার ঘরের। অনন্ত কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেল। এমন একটা নির্জন পরিবেশ সে আশা করেনি। সুটকেস টেবলে রেখে সে জামা খুলল। ছোকরা তার শরীরের যত্রতত্র হলুদ ছুঁইয়ে পেতলের রেকাবিটা নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বলল, "আপনি কি উপোস দিচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কিচেনে বিস্কুট আছে, বাদাম আছে খেতে ইচ্ছে করলে খাবেন। বেডরুম খোলা আছে। আমি গায়ে হলুদ পৌঁছে দিয়ে টোপর, মালাটালা কিনে নাপিত, পুরুত সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসব।"

অনন্ত সোফায় বসে রইল অনেকক্ষণ। একবার বারান্দায় গিয়ে নীচের রাস্তা দেখল। তিনটে দরজার একটা রান্নাঘরের। জলতেষ্টা পেয়ে গেছে। বেসিনের কল থেকে গ্লাসে জল নিয়ে খেল। মেঝেয় একধারে চারটে মদের খালি বোতল। ফ্রিজের পাল্লা খুলে দেখল একদমই ফাঁকা।

সে শোবার ঘরে এল। দেয়াল ঘেঁষে চওড়া খাট। ছোট নিচু টেবলের উপর টেলিফোন। দেয়াল আলমারি ছাড়াও রয়েছে ছোট একটা স্টিল আলমারি, ছোট দুটি চেয়ার, মেঝেয় কার্পেট, লাগোয়া বাথরুমের দরজা। বিপরীত দেয়ালে মদের রঙীন ক্যালেণ্ডারে আলস্য ভাঙ্গছে আড়মোড়া দিচ্ছে এক নগ্ন বিদেশিনী। ছবিটা দেখেই ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল তার দুটো কান। পেটের মধ্যের যাবতীয় বস্তু কুঁকড়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে সে টানটান হয়ে সোফায় শোয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নের মধ্যে কাটাতে কাটাতে অনন্ত বিয়ের রাত পেরিয়ে এল। সকালেও তার মনে হল অবাস্তব এক জগতের মধ্যে সে বাস করছে। সন্ধ্যার সময় বর-বৌ দিলীপ ভড়ের মোটরেই মধুবনের ফ্ল্যাটে এসে উঠল। রাতটা সে কাটাল সোফায়, রেবতী ঘরে শুয়েছিল দরজায় চাবি দিয়ে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

॥ ১০ ॥

অদ্ভুত সময়, অদ্ভুত জীবনের মধ্যে অনন্ত নেমে যাচ্ছে যেভাবে মানুষ চোরাবালিতে নামে। শেষবারের মত দুটো হাত বার বার মুঠো করে একটা শক্ত অবলম্বন পাবার জন্য যেমন আঁকপাঁকু করে, রেবতীকে আঁকড়ে অনন্ত তেমনি চেষ্টা শুরু করল। সে জানে তার দেরী হয়ে গেছে, তার গলা মুখ চোখ ডুবে গেছে, বাকি আছে উঁচু করে তোলা হাতদুটো। সে জানে জীবনকে শুষে নিতে যত বেশি ব্যগ্র হবে তত দ্রুত তলিয়ে যাবে। রেবতীকে তাই সে সমীহ করে।

তারা একই শয্যায় শোয় কিন্তু অনন্তের মনে হয় রেবতী বহু মাইল দূরে, তারা কথা বলে কিন্তু পরস্পরকে যেন বোঝাতে পারে না। বিয়ের এগারোদিন পর অন্য দিনের থেকে একটু আগেই বিকেলে বাড়ি ফিরে অনন্ত দেখল দরজায় তালা দেওয়া। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে বসল। আলুর দম-রুটি খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে সময় কাটাতে লাগল।

রেবতীকে দূর থেকে সে দেখতে পেল দ্রুত হেঁটে আসছে। ওর মেরুন-সবুজ তাঁতের শাড়িটা তারই কেনা। হাতে চামড়ার ছোট ব্যাগটা। কিন্তু একটা কালো অ্যাম্বাসাডার থেকে যে রেবতী নামল সেটা তার চোখ এড়ায়নি। সে চেষ্টা করল দেখতে মোটরে কে আছে, কিন্তু দেখতে পেল না। গাড়িটা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আশেপাশে না তাকিয়ে রেবতী হাঁটে। ও ঠিকই জানে বহু চোখ তাকে দেখছে। গ্রাহকের মধ্যে আনে না, চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে সে চলে গেল। তখন বাড়িমুখো চা-পিপাসু এক অফিস-ফেরত অশ্লীল শব্দ করে হাই তুলল। অনন্ত মাথাটা নামিয়ে দিল কাগজে।

হাতঘড়িতে সে দেখল পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে রেবতী চলে যাওয়ার পর। ঘড়িটা সে বিয়ের দু'দিন পর কিনেছে। বাবার কেনা ওয়াল ক্লকটা আজও নিখুঁত সময় দিয়ে যাচ্ছে। বাড়িতে সময় জানতে তার অসুবিধা নেই, বাইরে প্রায় প্রত্যেকের হাতেই ঘড়ি। দরকার হলে সে জিজ্ঞাসা করে নেয়। তাই ঘড়ি কেনার জন্য 'বাজে খরচের' দরকার তার হয়নি। এখনো দরকার হয় না, তবু কিনেছে। উপরের কাকিমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "শ্বশুর বাড়ি থেকে কি কি দিল ?"

প্রথমেই সে বলে ফেলেছিল, ঘড়ি। তাই সে ঘড়িটা কিনে ফেলে। রেবতীর ঘড়ি আছে। তবু সে তিনশো টাকায় তাকে একটা কিনে দেয়।

অনন্ত যখন ফিরল রেবতী তখন চা করছে। শার্টটা খোলার পর গেঞ্জিটা খুলতে গিয়েও খুলল না। বাড়িতেও গেঞ্জি পরে থাকা সে শুরু করেছে বিয়ের পর।

"চা আমাকেও একটু দিও।"

"এই ফিরলে ?"

"হ্যাঁ।"

কেন যে মিথ্যাকথাটা বলল তা সে জানে না। আপনা থেকেই মুখে এসে গেল।

"কি করলে সারা দুপুর ?"

রেবতী উত্তর দেবার আগে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চাউনিটা তুরপুণের মত, ঘুরতে ঘুরতে তার মনের মধ্যে গর্ত করে যাচ্ছে, যার মধ্য দিয়ে প্রশ্নের পিছনের উদ্দেশ্যটা দেখা যাবে। অনন্ত তার মুখটাকে নির্বিকার করে রেখে দিল, হাতে চায়ের কাপ নেবার সময়।

"কিছুই তো করবার নেই। তাই একবার বাড়ি থেকে ঘুরে এলাম। মা'র মাথার যন্ত্রণাটা খুব বেড়েছে, ডাক্তার দেখাতে হবে মনে হচ্ছে।"

"স্পেশালিস্ট দেখানোই ভাল।"

"অনেক টাকার ধাক্কা।"

"টাকার জন্য ভাবতে হবে না।"

রেবতী তাকাল এবং মিষ্টি করে হাসল। অনন্ত উত্তেজনা বোধ করে অথবা বহুদিন পর সাংসারিক দায়িত্বের স্বাদ পেয়ে, যেটাই হোক, বলল, "মাথার ব্যথার কখনো অবহেলা করতে নেই। স্পেশালিস্ট কতো আর নেবে···পঞ্চাশ, একশো, দুশো ? অবহেলা যদি না করা হতো তাহলে আমার মায়ের ক্যান্সার গোড়াতেই ধরা পড়ত। কালই আমি খোঁজ নেব। আমাদের মালিক সমীরেন্দ্র বসু মল্লিককে যে ট্রিটমেন্ট করেছিল তার কাছেই বরং যাব।"

"এত তাড়াহুড়োর দরকার কি···একটু বাজারে যাবে, ঘি, গরম মশলা ফুরিয়েছে। কপিটা আজই রেঁধে ফেলি।"

রাতে অন্যদিনের মত রেবতী আজ বাঁদিকে না ফিরে অনন্তের দিকে কাত হয়ে শুল। কিছুক্ষণ পর তার বাঁ হাত অনন্তের বুকের উপর পড়ল। সে নিঃশ্বাস চেপে শক্ত হয়ে শুয়ে রইল। এই প্রথম রেবতী তাকে স্বেচ্ছায় স্পর্শ করল, এটা কিসের আভাস দিচ্ছে ?

সে প্রায় চুপিসাড়ে তার ডান হাত বিছানা থেকে এমন ভাবে বুকের দিকে আনতে লাগল যেন রেবতীর হাতটা একটা পাখি সামান্য নড়াচড়া টের পেলেই উড়ে যাবে।

ধীরে ধীরে সে তা রাখল রেবতীর আঙুলের ওপর। মুঠিতে চাপ দিল এবং হাতটায় টান দিয়ে কাছে আসার জন্য ইঙ্গিত করল।

বাহুতে ভর দিয়ে মাথাটা সামান্য তুলে রেবতী ঝুঁকে পড়ল এবং অনন্তের ঠোঁটের উপর আলতো চুমু দিল।

অনন্ত সম্বিৎ হারানোর আগে বুকের মধ্যে প্রচণ্ড চীৎকার শুনতে পেল। একটা অস্থিরতা তার শরীরটায় দাপিয়ে যাচ্ছে। একটা দুর্লভ চূড়ায় সে উঠবে। সেখান থেকে তার জীবনের পিছন দিকে একবার মাত্র সে তাকাবে।

রেবতী মাথাটা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অনন্ত দুহাতে তাকে জাপটে ধরল।

"নাহ্।"

"হ্যাঁ।"

রেবতী চেষ্টা করল অনন্তর মুঠি আলগা করতে। অনন্ত হুড়মুড় করে তার বুকের

উপর ভেঙ্গে পড়ল, এলোপাথারি চুমু দিতে লাগল ওর গালে, গলায়, বুকে।

"না আ আহ্, কি ছোটোলোকমি হচ্ছে!"

রেবতীর নখ বসে গেছে অনন্তের ঘাড়ে। সে কিছুই বোধ করছে না শুধু একটা অন্ধ রাগ ফুঁসে উঠছে তার মাথার মধ্যে।

"আমি তোমার স্বামী।"

"তাতে কি হয়েছে!"

"তাহলে বিয়ে করলে কেন?"

"শুধু এইজন্যই বিয়ে করা?"

"এটাও একটা কারণ।"

"একটা নয়, তোমার কাছে এটাই একমাত্র কারণ।"

রেবতীর স্বরে তাচ্ছিল্যের ছোঁয়া রয়েছে। অনন্তের ইচ্ছা করছে ঘুঁষি মেরে মেরে ওর মুখটাকে থেঁতলে দিতে।

"তোমার একটা মেয়েমানুষের শরীর দরকার, যে কোন, যেমন তেমন, মেয়েমানুষ।"

অন্ধকারে মুঠো করা অনন্তের হাতটা উঠেছিল, সেটা দেখতে পেলে রেবতী হয়তো কথাগুলো বলত না। কয়েক সেকেণ্ড পর হাতটা মন্থরভাবে নেমে গেল।

মাত্র এগারো দিন তাদের বিয়ে হয়েছে। অনন্তের মনে হচ্ছে, তারা আর মিলতে পারবে না। বোকার মত সে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। চল্লিশটা বছর কেটেছে যেভাবে বাকি জীবন সেইভাবেই নয় কেটে যেত।

জীবনকে সে কিছু কি দিয়েছে যে আজ প্রতিদান আশা করছে? ভাই বোন মা সবাই একে একে সরে গেছে। তাদের জন্য সে সতেরো বছর বয়সে বাবার জায়গা নেওয়ার দম্ভে বলেছিল, "আমি সবাইকে দেখব।" মা বলেছিল, "তুই সুখী হবি।"

সুখ!

রেবতী ওপাশ ফিরে দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে।

পরদিন যথারীতি সে বাজার গেল, স্নান করল, ভাত খেল এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। অন্যদিনের মত সন্ধ্যার সময় ফিরল।

অন্ধকার ঘরে রেবতী শুয়েছিল। আলো জ্বালতেই চোখ বন্ধ করল।

"শুয়ে যে! শরীর খারাপ নাকি?"

"না···ভাল লাগছে না তাই।"

"রান্না করবে না?"

"যাচ্ছি।"

অলু একদিন এসেছিল ঘণ্টাখানেকের জন্য। তাকে বলেছিল: 'এমন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ভাব করলে কি করে?' আর পাঁচশো টাকা চেয়েছিল। দু'দিন পর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে মানিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

একদিন সন্ধ্যায় দোতলার কাকিমার সঙ্গে রাস্তায় মুখোমুখি হতেই তিনি একথা সেকথার পর গলা নামিয়ে বলেন, "তোকে তো ন্যাংটো বয়স থেকে দেখছি, তুই তো আমার ঘরে ছেলে, বলতো প্রায়ই গাড়ি নিয়ে একটা লোক তুই বেরিয়ে যাবার পরই আসে আর বৌমা সেজেগুজে তার সঙ্গে বেরিয়ে যায়···কে লোকটা?"

"গাড়ি নিয়ে!"

"ওই মোড়ে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে, আমি অবিশ্যি দেখিনি, রেডিওয় গান গায় প্রফেসরের বৌ সঙ্ঘমিত্রা—ওদের ঝি দেখেছে। তোর কাকাবাবুও দুদিন দেখেছেন। দুপুরে পার্ক স্ট্রিট দিয়ে দুজনকে গাড়ি করে যেতে।"

শুনতে শুনতে অনন্তের বুকটা খালি হয়ে যেতে লাগল। একটা নোংরা সন্দেহ পাড়ায় ছড়িয়েছে। তার নিজেরও ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। তাছাড়া একবারের জন্যও রেবতী তাকে বলেনি সে দিলীপ ভড়ের সঙ্গে বেরিয়েছিল। গোপন করা কেন? মাকে স্পেশালিস্ট দেখাবার জন্য আর তো একবারও বলল না। মা'র কাছে সেদিন সত্যিই গেছল কি!

"ওহো, দিলীপদা, উনি তো রেবতীর মাসতুতো দাদা।"

কাকিমার মুখের ভাবের বিশেষ কোন বদল ঘটল না। রেবতীকে দোতলার কেউ পছন্দ করে না। সে ওদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না।

"হোক দাদা, লোকে তো পাঁচকথা বলে, তুই একটু বারণ করিস।"

রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে অনন্ত একসময় জিজ্ঞেস করল, "দিলীপদা আসে?"

সে টের পেল পাশের শরীরটা টানটান হয়ে শক্ত হল।

"পাড়ায় অনেকে খারাপ ভাবে নিয়েছে।"

"কি নিয়েছে?"

"ওর সঙ্গে তোমার বেরোনটা।"

হঠাৎ অনন্তের চোখে ভেসে উঠল মধুবনের খালি ফ্ল্যাট আর শোবার ঘরের দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের ছবিটা। বুকটা তার দুরদুর করে উঠল। একটা বাজে সন্দেহ তার মনে ঝিলিক দিল।

"আমি কার সঙ্গে বেরোই না বেরোই তাতে পাড়ার লোকের কী?"

"তাদের কিছুই নয়, কিন্তু আমার কিছু।"

"তোমার!"

"কেন বেরও?"

এত কঠিনস্বরে অনন্ত কখনো কথা বলেনি।

"বেরোলেই বা, কিছুক্ষণ মোটরে ঘুরলে কি হয়েছে?"

অনন্ত বলতে যাচ্ছিল, বেরিয়ে কোথায় যাও? জিবের ডগা থেকে সে কথাটা প্রত্যাহার করল।

"বিয়ে করাটা উচিত হয়নি।"

"কার, তোমার ?"

"তোমার···কোন দরকার ছিল কি ?"

"ছিল।"

"ছিল ?"

"বলা যাবে না। ওর কাছে আমরা অনেক কৃতজ্ঞ, অনেক ঋণী।"

"তার জন্য আমাকে বলি হতে হবে ?"

তাদের মধ্যে আর কোন কথা হয়নি। রেবতী হাত বাড়িয়ে অনন্তের বাহু স্পর্শ করল। সে কোন উত্তেজনা অনুভব করল না।

শান্তভাবে কয়েকটা দিন কেটে যাবার পর, বাড়ি ফিরে অনন্ত দেখল দরজায় শিকল তোলা, তালা ঝুলছে না। ঘরে যাওয়ামাত্র টেবলে রাখা চিরকুটটা তার চোখে পড়ে।—"আমার আর ভাল লাগছে না। চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না। রেবতী।"

রান্নাঘরে রাতের খাবার ঢাকা দেওয়া। তার দেওয়া কোন কিছুই নিয়ে যায়নি। ঘড়িটা টেবলে রাখা।

খাটে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতে থাকতে অসম্ভব একটা শ্রান্তির শব্দ তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল। আবার সে একা। পাঁচমাসের জন্য সে অন্য একটা জগতে ঘুরে প্রত্যাবর্তন করল। এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com সাইট থেকে ডাউনলোডকৃত।

একদিন পর জেঠিমা বলল, "বৌমাকে দেখছি না যে ! বাপের বাড়ি গ্যাছে ?"

"হ্যাঁ।"

"কদ্দিনের জন্য ?"

"মাসখানেক থাকবে।"

একমাস সময় পেল। এর মধ্যে কেউ কৌতূহল দেখাবে না। কিন্তু তারপর ? জানাজানি হবেই। মুখ দেখাবে কি করে ? যে শুনবে প্রথমেই বলবে—কার সঙ্গে বেরিয়ে গেল ? কিংবা—কোথায় গিয়ে উঠেছে ?

খবরটা রেবতীর বাড়ির লোকেরা কেমন ভাবে নেবে ? তারা কি ওকেই সমর্থন করবে ?···কোথায় গিয়ে উঠেছে ? বাড়িতে না মধুবনের ফ্ল্যাটে !

নানান অনুমান, প্রশ্ন এবং দ্বিধা কাটিয়ে চারদিন পর রাত্রিবেলায় সে রেবতীদের বাড়িতে হাজির হল। তাকে দেখে প্রত্যেকের মুখে অস্বস্তি ফুটে উঠল। সে বুঝল, এরা তাহলে জানে।

"রেবতী কি এখানে ?"

ওর মা ইতস্তত করে বলল, "বিকেলেও তো ছিল···বলে যায়নি কোথায় গেছে।"

"তাহলে আমি একটু ঘুরে আসি।"

"একটু কিছু মুখে দিয়ে যাও বাবা।"

অনন্ত ওখান থেকে বেরিয়ে এল মধুবনের সাততলায়। দরজা খুলল দিলীপ ভড়ই।

"আসুন।"

যেন তার জন্যই অপেক্ষা করছিল। অনন্ত সোফায় বসল। সামনের সোফায় দিলীপ ভড়। হাতে আধভরতি মদের গ্লাস। ছোট্ট করে চুমুক দিল।

"রেবতী এখানে নেই। এসেছিল। আমি ফিরে যেতে বলি, ও রাজী হয়নি। ওকে তাই পাঠিয়েছি আমাদের দেশের বাড়িতে।"

"ফিরে যেতে···কোথায় ফিরে যেতে ?"

"আপনার কাছে।"

"আমি তো ওকে গ্রহণ নাও করতে পারি, তখন যাবে কোথায় ?"

দিলীপ ভড় বড় করে হাসলেন। গ্লাসটা শেষ হয়ে গেছে।

"আমার কাছে।"

"আপনি ওকে ভালবাসেন ?"

"নিশ্চয়।"

"তাহলে বিয়ে দিলেন কেন ? আমারও তো একটা জীবন আছে।"

"সেইজন্যই ওকে ফিরে যেতে বলি। ঠিক এই কথাটাই ওকে বলেছি। ও শুনল না।"

"পরিচিতদের কাছে এবার মুখ দেখাব কি করে !"

"বলে দিন বাস চাপা পড়ে মারা গেছে, কিংবা কলেরায়।"

"তা হয় না, পরে ওকে কেউ দেখে ফেললে আরো জানাজানি হবে।···অবশ্য আমার এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই···বৌ যদি দুশ্চরিত্রা হয়, স্বামী কি করতে পারে ?"

"আপনাকে কেউ দোষ দেবে না ?"

"না, সবাই জানে আমি ভালো ছেলে।"

কথাটা বলেই অনন্তের বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা শুরু হল। ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে এল তার মুখ। ফ্যাল ফ্যাল করে সে দিলীপ ভড়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটে বলল, "কিন্তু সত্যিই কি আমি তাই !"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

॥ ১১ ॥

প্রায় তিনঘণ্টা হয়ে গেল অনন্ত এলোমেলো হাঁটছে। রাস্তায় ট্র্যাফিক কমে গেছে একটা ট্রামের সামনে লাল বোর্ডে "লাস্ট কার" লেখাটা চোখে পড়েছে। পথচারীরা প্রায় নেই। দু'একটা আধ ভেজানো দোকান, ভিতরে আলো জ্বলছে। বগলে চট নিয়ে দু'তিনজন শোবার জায়গা খুঁজছে ফুটপাথে। অনন্ত আলোজ্বলা গির্জার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে তারপর নিজের হাতঘড়ি দেখল। বন্ধ হয়ে আছে।

"ইস্‌স্ একদম ভুলে গেছি।"

ঘড়িতে দম দিতে দিতে সে আরো জোরে হাঁটা শুরু করল। হাঁটুর কাছে টান ধরেছে। কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে গিয়ে হাঁটুর পিছনে শিরাটায় হাত বুলোল, কিন্তু সে গতি কমাল না। জলতেষ্টা পাচ্ছে অসম্ভব। থুতু ফেলতে গিয়ে শুকনো জিবটা টাগরায় আটকে গেল।

দরজায় আস্তে টোকা দিল। জায়গাটায় আলো নেই, তখনো চোলাইয়ের গন্ধ ভাসছে। আবার সে টোকা দিল।

"কে ?"

"আমি।"

দরজা খুলে একটা ছায়া দুই পাল্লার ফাঁকে ভেসে উঠল। তখন সে কাতর অনুনয়ে বলল, "আমি শক্তিপদর ছেলে, আমার এবার ভালবাসা দরকার···দেবে ?"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG